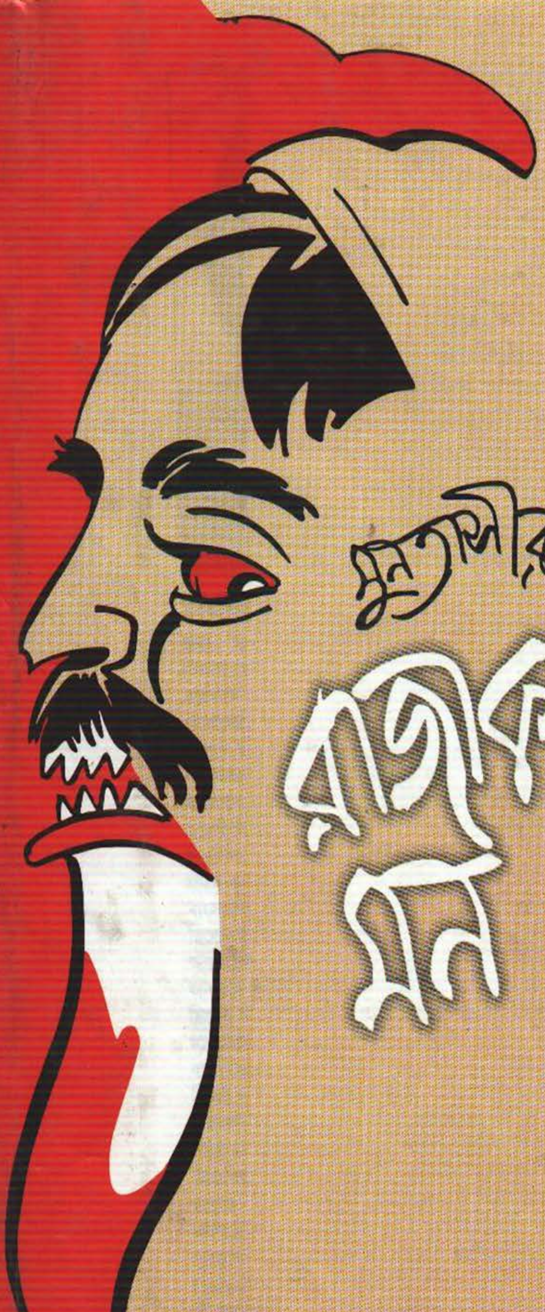

মুনতাসীর মামুন

রাজাকারের মন

রাজাকারের মন মুনতাসীর মামুন দ্বিতীয় খণ্ড

রাজাকার বলে সম্বোধন করি আমরা অনেককে, বুঝিও যে কে রাজাকার বা কে রাজাকার নয়। কিন্তু, রাজাকারের মন কেমন তা নিয়ে কখনও ভাবিনি। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন রাজাকারদের রচনা দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন রাজাকারের মন, তাদের ভাবনা-চিন্তা, দর্শন। দেখিয়েছেন তারা কীভাবে কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটায় আর কীভাবেই বা সাধারণের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট থাকে।
রাজাকারের মনোজগৎ নিয়ে বাংলা ভাষায় এর আগে এত চমৎকার বিশ্লেষণ আর কোনো লেখক করেননি।
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গত তিন দশকে নানা ধরনের বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী দু'পক্ষ প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। বিশ্লেষণপূর্ণ কোনো রচনা রচিত হয়নি তাদের নিয়ে। ড. মুনতাসীর মামুন নয়জন রাজাকারের আত্মজীবনী নিয়ে রচনা করেছিলেন *রাজাকারের মন।* ২০০০ সালে আমরা তা প্রকাশ করেছি। এ বছর আমরা প্রকাশ করলাম *রাজাকারের মন*-এর দ্বিতীয় খণ্ড। ছয়জন রাজাকারের আত্মজীবনীর ওপর ভিত্তি করে অধ্যাপক মামুন দ্বিতীয় খণ্ডটি রচনা করেছেন।
এই গ্রন্থ শুধু গবেষক নয়, বাঙালি মাত্রেরই পড়া উচিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চর্চায় *রাজাকারের মন* যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা।

ISBN 984 410 240 5

মুনতাসীর মামুন

জন্ম : ১৯৫১ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম. এ., পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। লেখালেখি করছেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ছাত্রজীবনে জড়িত ছিলেন ছাত্র আন্দোলনে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিটি সংস্কৃতি ও গণআন্দোলনে। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম ডাকসু নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক। একই সময়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি। তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'ডাকসু'র মুখপত্র 'ছাত্রবার্তা'। এ ছাড়া বাংলাদেশ লেখক শিবির ও বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও যথাক্রমে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুগ্ম সম্পাদক। ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তিনিও একজন। এ ছাড়াও তিনি জড়িত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।
বাংলাদেশের লেখালেখির জগতে মুনতাসীর মামুন একটি বিশিষ্ট নাম। গল্প, কিশোরসাহিত্য, প্রবন্ধ, গবেষণা, চিত্র-সমালোচনা, অনুবাদ ইত্যাদিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সেই সাথে রাজনৈতিক ভাষ্যে অর্জন করেছেন বিশেষ খ্যাতি। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, ড. হিলালী স্বর্ণপদক পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৩) ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত।
স্ত্রী ফাতেমা মামুন একজন ব্যাংকার।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

রাজাকারের মন

দ্বিতীয় খণ্ড

মুনতাসীর মামুন

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

মাওলা ব্রাদার্স ।। ঢাকা

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© ফাতেমা মামুন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
দীপ্তি কম্পিউটার
বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 240 5

RAJAKARER MON (Perception of Pakistani collaborators) by Dr. Muntassir Mamoon. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka One Hundred Fifty Only. © Fatema Mamoon.

উৎসর্গ

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাথীদের

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

ভূমিকা

গত বছর প্রকাশিত হয়েছিলো 'রাজাকারের মন'-এর প্রথম খণ্ড। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অনেকে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান এবং আমার সহকর্মী জনাব আবু মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত প্রথম তিনটি বইয়ের সন্ধান দেন। আমার আরেক সহকর্মী জনাব আশফাক হোসেন মিছিরউল্লাহ্‌র বইটির ফটোকপি প্রদান করেন। এছাড়া কিছু দলিলপত্রও নজরে পড়ে। তখন ঠিক করি 'রাজাকারের মন'-এর আরেকটি খণ্ড লেখা যেতে পারে। এবং তারই ফল বর্তমান গ্রন্থটি।

বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে আমার মনে হয়েছে, রাজাকারদের কূট-কৌশল জানতে হলে তাদের রচনাগুলি পড়া দরকার। এ বইতে পাঠক লক্ষ্য করবেন প্রচুর উদ্ধৃতি আছে এবং পরিশিষ্ট-এ অনেক রচনা দলিল হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। এর কারণ, এক. এসব বই এখন দুস্প্রাপ্য; দুই. রাজাকারের মন কীভাবে কাজ করে তা তাদের লেখা পড়লে সহজে বোঝা যায়।

বর্তমান খণ্ডে, প্রথম খণ্ডের প্রথম পাঁচ অধ্যায় অবিকল রাখা হয়েছে যাতে কোন পাঠক আলাদাভাবে বইটি পড়লেও পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন করতে পারেন। শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায়ও প্রথমঅধ্যায়ের অনুরূপ নতুনভাবে বত্রিশ অধ্যায়টি লেখা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ প্রথম খণ্ডটি ধারাবাহিকভাবে ছেপেছিলো। দ্বিতীয় খণ্ডটিও তারা ধারাবাহিকভাবে ছাপিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাজাকার ও রাজাকারির বিরুদ্ধে অনড়যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত 'দৈনিক জনকণ্ঠ'-এর কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে উপদেষ্টা সম্পাদক জনাব তোয়াব খানকে ধন্যবাদ জানাই।

মুনতাসীর মামুন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১.১.২০০১

১

'রাজাকার','দালাল', যোগসাজশকারী বা 'কোলাবরেটর', 'আল-বদর', 'আল-শামস' শব্দগুলির সঙ্গে ১৯৭১ সালের আগে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। দালাল শব্দটির সঙ্গে অবশ্য পরিচয় বাঙালির অনেক দিনের। তবে, ১৯৭১ সালে 'দালাল' বা 'দালালি' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন গ্রুপের গঠন, গ্রুপের সদস্যদের মন-মানসিকতার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে শব্দগুলির।

১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল কে? ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দালাল অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস অর্ডার ১৯৭২' জারি করা হয়। এতে দালাল বা যোগসাজশকারী বা কোলাবরেটরদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে—

"১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা, সহযোগিতা বা সমর্থন করা।

২। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার পাকবাহিনীকে বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান বা কোনো কথা, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধমে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করা।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের চেষ্টা করা।

৪। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫। পাকবাহিনীর অনুকূলে কোনো বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া এবং পাকবাহিনীর কোনো প্রতিনিধি, দল বা কমিটির সদস্য হওয়া। হানাদারদের আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ নেয়া।"

উল্লিখিত সমস্ত গ্রুপই এর আওতায় পড়ে। যে অর্থে রাজাকার, কোলাবরেটর, আল-বদর বা পাকিস্তানপন্থী—সবাইকেই দালাল বলা হয়।

রাজাকার বাহিনী বা রাজাকারদের সংগঠন করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালে জুন মাসে রাজাকার

অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে, রাজাকার বাহিনীর তিনিই স্রষ্টা। তারা যথেষ্ট খেদমত করেছে পাকিস্তানি বাহিনীকে, যে কারণে তাঁর বইটি তিনি তাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছেন।

আল-বদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পরপরই এটি গঠিত হয়। তবে, রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোনো আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু, পাকিস্তানি বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। আল-বদর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ হানাদার বাহিনীই যুগিয়েছে। রাও ফরমান আলির নোটে আল-বদরদের উল্লেখ আছে। অবশ্য, সরকারিভাবে পাকিস্তানি বাহিনী তা অস্বীকার করেছে। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন বর্তমান জামায়াত ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তারা 'আল-বদর দিবস' পালন করে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নিজামী 'দৈনিক সংগ্রাম'-এ আলবদর বাহিনী সম্পর্কে লেখেন—

"...আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল-বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল-বদরের তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ, সেই সর্বগুণাবলী আমরা দেখতে পাব।"

"পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আল-বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম। তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।"

রাজাকারদের সঙ্গে আল-বদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে, কিন্তু, আল-বদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল

অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিকেশ করে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা অনুধাবন করেছিলো, যে ধরনের শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধ তো ছিল একটি আদর্শগত লড়াইও। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাদেশ তত্ত্বে বিশ্বাসী যা পরে প্রতিফলিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের সংবিধানে। দালালরা ছিল পাকিস্তান তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তাদেরও বিভিন্ন পর্যায় ছিল। রাজাকারদের মন-মানসিকতা বুঝতে হলে পাকিস্তান তত্ত্ব বা প্রত্যয় এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ের খানিকটা ব্যাখ্যা দরকার। তা হলে বুঝতে পারব, কারা দালালি করেছে, কেন করেছে।

বাকি রইল আল-শামস। এরা আল-বদর ধরনেরই আরেকটি স্কোয়াড। হত্যাই ছিল যাদের মূল লক্ষ্য।

২

এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধ কাজ করেছে সেই ষষ্ঠ শতক থেকেই। ১৯৪৭-এর আগে এই আঞ্চলিকতা-বোধ রূপান্তরিত হতে থাকে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাঙালি হলেও আগে মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিলো। গত শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিলো। সম্প্রদায় হিসেবে সে ছিল অধস্তন। একজন বর্ণহিন্দু একজন শূদ্রের সঙ্গে যে ব্যবহার করে একজন মুসলমানের সঙ্গেও সে ব্যবহারে কোনো তারতম্য ছিল না।

আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন একটি প্রবন্ধে বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"মুসলমানদের এই পৃথক পরিচয় দাবি বাহ্যত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমাজ-পরিবেশে একটি প্রান্তিকীকৃত (marginalised) অর্থাৎ ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এর ফলে, উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জনসংখ্যার অবস্থানগত বাস্তবতা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে হিন্দুরা ছিল প্রায় সকল সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং মুসলমানরা ছিল ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়েছিলো। মুসলিম লীগ ছিল নেতৃত্বে। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে বাঙালি মুসলিম লীগ নেতারা ছিল অধস্তন। অন্যদিকে, বাঙালি হিন্দুদের দেশত্যাগ বেশ একটা বড়সংখ্যক বাঙালি মুসলমানকে সুযোগ করে দিয়েছিলো সম্পদের ভিত্তি গড়ার। রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল যাদের সুবিধাটি তারাই পেয়েছিলো। এভাবে আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো কায়েমি স্বার্থ। তবে, পাকিস্তানি আদর্শকে সামনে রেখে অর্থাৎ ধর্মকে ব্যবহার করে 'ইসলামপন্থী' বেশ কিছু দলের সৃষ্টি হয়, যেমন—জামায়াত ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি। মুসলিম লীগের সঙ্গে এদের লড়াইটা ছিল আদর্শ থেকে ক্ষমতা করায়ত্তের।

এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতির প্রশ্নেই দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৭-এর পর থেকে, যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অর্থনীতি। মধ্যবিত্ত তো বটেই, সাধারণ বাঙালির প্রসারণের সুযোগই সংকুচিত হয়ে গেল। ফলে, সাংস্কৃতিক সত্তায় স্বাধীনতা ও প্রসারণের দাবিতে এগিয়ে এল পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরেই অন্যান্য দল, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রধান।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সবসময় ইসলামকেই শোষণ ও কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। শাসকদের বিরদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হলেই তা দেখা হতো ইসলামদ্রোহ হিসেবে। সমীকরণটি ছিল এরকম—ইসলামের বিরোধিতা মানে ভারতকে সমর্থন। ইসলামের প্রতীক পাকিস্তান, হিন্দুত্বের প্রতীক ভারত। পাকিস্তানি শাসকদের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে হিন্দুত্ব সমর্থন। কেন্দ্রের অধস্তন বাঙালি সহযোগীরাও তা বিশ্বাস করত এবং প্রচার করত (যেমন মুসলিম লীগ, জামায়াত)। অধস্তন হলেও তারা তৃপ্তি পেত এই ভেবে যে, তারাও ক্ষমতার সহযোগী, কখনও কখনও অংশীদার এবং সে সুযোগে অর্থনৈতিক উপায়েরও সুবিধাভোগী। তবে, তাদের সবাই অর্থনৈতিক সুবিধার অংশীদার ছিল তা নয়, কিন্তু মনোজগতে যে আধিপত্য সৃষ্টি করেছিল দল তা ভাঙা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তান প্রত্যয়ে নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হলো। ধর্ম ছাড়াও শাসনের উপাদান হিসেবে যুক্ত হলো আমলা, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য। এর অর্থ, আমলাতন্ত্র, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্র কর্তৃক সিভিলসমাজ ও রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ লুটের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ করে পাকিস্তানবিরোধী)। এ আদর্শ, আরো অনেক বাঙালিকে যুক্ত করতে পেরেছিল শাসকদের সঙ্গে।

এই সামগ্রিক বঞ্চনার আবেগ পাকিস্তানের পরিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মনে সেই পুরনো আঞ্চলিকতার রেশ ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ একটি একক যা বাংলাদেশ। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা বা স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা তারই প্রতিফলন। ছয় দফা প্রত্যাখ্যাত হলে সৃষ্টি করা হয় 'পাকিস্তান'-এর বিপরীতে সোনার বাংলা মিথ। আঞ্চলিকতা-বোধ উত্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্ন মেনে নিতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে সোনার বাংলা শ্মশান কেন? লিখেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর—"এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্গঠিত হয়েছে ইতিহাসের দিক থেকে মৌল এবং স্থায়ী এক প্রতিরোধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের মধ্যে। সোনার বাংলার এই নির্মাণের ফলে পাকিস্তানের কেবল কথা বলার অধিকার আছে এবং পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ কেবল নীরব, স্তব্ধ, মৌন, এই ধারণা যায় বদলে। এটি বদলে দেয় পরিস্থিতি এবং সাব অলটার্ন বাঙালিদের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করে দ্বৈরথের সম্মুখীন হয়ে, নিশ্চিতভাবেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস তত্ত্বের ভিত্তিতে।"

শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়। মানসিকভাবে বাঙালি প্রস্তুত হয়ে ওঠে দ্বৈরথের জন্য। অন্যদিকে, ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোজগতে পরিবর্তন আসা শুরু করলেও পাকিস্তান আদর্শের ধ্বজাধারীরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল মনোজগতে এবং কায়েমি স্বার্থ কেন্দ্রগুলিতে তাদের আধিপত্য কেউ ভাঙতে পারবে না, তা অটুট।

৩

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পাকিস্তান আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে বাংলাদেশ আদর্শ। পাকিস্তান আদর্শ যারা অটুট রাখতে চেয়েছিল তারা গুরুত্ব দেয় পেশিশক্তির ওপর। পরিণামে শুরু হয় তাদের ভাষায় 'গৃহযুদ্ধ'। বাংলাদেশ আদর্শের পতাকাবাহীদের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান আদর্শবাদীদের জন্য বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে যাঁরা নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা মানসিক কষ্টের শিকার হলেও নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। তাঁরা মক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তান আদর্শের বিপর্যয়

হিসেবেই দেখেছিলেন। কারণ, তাঁদের কাছে কখনও মনে হয়নি বাঙালি পরিচয়টি প্রথম, পাকিস্তানি পরিচয় আসে তার পরে।

রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা ফিরতে চায়নি। কারণ, পাকিস্তান আদর্শ ও কেন্দ্রের সেনাবাহিনীর শক্তি তাদের কাছে ছিল অজেয়। তাদের মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আদর্শ জয়ী হলে তাদের স্থান হবে বিপন্ন। যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতার অংশীদার বা কায়েমি স্বার্থের অংশীদার হয়েছিলো সেটি থাকবে না। নতুন বাংলাদেশে তাদের স্থান থাকবে না। এরচেয়ে পাকিস্তানে অধস্তন হিসেবে ক্ষমতার সহযোগী হওয়া ছিল শ্রেয়। এখানে আদর্শ বা ধর্মের প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সেটি গৌণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কি মুসলমান ছিল না? বা ইসলামে বিশ্বাস করত না? তবে, ধর্মটিকে ঢাল হিসেবে রাখা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। তারা যা করেছে তা কি ইসলামি আদর্শে অনুমোদিত? ফলে, অস্তিত্বরক্ষার জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা করার করেছে। ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সাধারণ আল-বদরের মতো অস্ত্রহাতে ঘোরা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। ফলে, যার যার অবস্থান থেকে সে সে কাজ করে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানি দালালদের, দালালদের মধ্যে অবস্থাগত কারণে আবার বিভিন্ন গ্রুপের। এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জামায়াত ইসলাম ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘ। পাকিস্তানের অ্যাকাডেমিশিয়ান আব্বাস রশীদ 'পাকিস্তান মতাদর্শের পরিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন— "উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইউব খানের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সনাতনপন্থী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে, সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয় বরং তাদের স্থান ইতিমধ্যে দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামাত-ই ইসলামী। জামাত-ই ইসলামীর নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের কর্মী ও সদস্যরা শান্তি কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট এই শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহ দমনে সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। আদর্শগত পর্যায়েও জামাত-ই ইসলামীর সমর্থন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ সামরিক বাহিনী স্বাগত জানিয়েছিল সর্বান্তঃকরণে।" তাই আমরা দেখি, আল-বদর ও আল-শামসদের মধ্যে জামায়াতের কর্মীই বেশি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের 'দৈনিক পাকিস্তানে'র সংবাদ অনুসারে "স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে

জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রচনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।" এর সদস্যরা ছিল পাকিস্তান আদর্শের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এলিট, যারা অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে যায়নি। অন্যান্যের তুলনায় শান্তি কমিটির সদস্যরা ছিল বলা যেতে পারে 'নরমপন্থী'। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় বা অংশগ্রহণে তারা নিষ্ক্রিয় ছিল না অনেক ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন পেশায় বা পদে থেকে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সেই সময়, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'কোলাবরেটর' হিসেবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন।

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজাকার'— ফারসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দরাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছিলো রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী— "প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙ্গালী হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়তঃ গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়— এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়েই গঠিত হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী। আবু সাইয়িদ তাঁর 'সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আজম' গ্রন্থে জনৈক রাজাকারের পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছেন যেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

> "This is to certify that Mr.Haroon-ur-Rashid Khan, S/o. Abdul Azim Khan, 36, Purana Paltan Lane, Dacca-2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is

trained Razakar. He has been issued a Rifle No-776 ... with ten round ammunition for self-protection.

Sd/- illegible
IN CHARGE
RAZAZKAR AND MUZAHID
JAMAT-E-ISLAM
91/92, Siddique Bazar, Dacca."

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

আবু সাইয়িদ জানাচ্ছেন, আল-বদর বাহিনীর গঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়। "জামালপুর মহকুমায় আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান। আগস্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।"

২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। জানাচ্ছেন সাইয়িদ, "এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একসিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আফরাফুজ্জামান সহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আল-বদর কমান্ডাররা অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মসলিশের শুরার সদস্য সামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল—

১। মোস্তফা শওকত ইমরান। ২। নূর মোহাম্মদ মল্লিক। ৩। এ. কে. মোহাম্মদ আলী। ৪। আবু মোঃ জাহাঙ্গীর। ৫। আশরাফুজ্জামান। ৬। আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস। ৭। সর্দার আবদুস সালাম।"

আল-বদরদের কার্যকলাপ সুবিদিত। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এভাবে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে।

৪

১৯৭১ সালে তো বটেই, তারপর তিন দশক পর্যন্ত, এদেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কীভাবে কাজ করে বা মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে সে ব্যাপারে গভীরভাবে কেউ চিন্তা করেছেন বলে জানি না।

আগেই উল্লেখ করেছি মুক্তিযুদ্ধের বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা স্বায়ত্ত-শাসনেরও বিরোধিতা করেছেন অনেকে ১৯৭১ সালের আগে। ঐ বিরোধিতা, যুক্তির খাতিরে অগ্রহণযোগ্য এমন বলা যাবে না। কিন্তু, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর এবং স্বাধীনতার পর এ যুক্তি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংবিধানের প্রথম পাতাতেই লেখা আছে—

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের (সংশোধিত পাঠ) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

এরপর স্বাধীনতাসংক্রান্ত কোনো বিষয় আদালতের এখতিয়ারে পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু, বাংলাদেশ যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ সেহেতু এখানে এর উল্টোটাই ঘটেছে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতাপক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি আছে। এ প্রশ্ন অবশ্যই অনেকে করতে পারেন যে, স্বাধীনতালাভের পর একটি দেশে আবার স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হয় কীভাবে? পৃথিবীতে, এদেশেই একমাত্র সরকার ও বিরোধীদল একই সঙ্গে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির সঙ্গে নমনীয় ব্যবহার করে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতার বিপক্ষের পত্রিকাসমূহ অবাধে প্রকাশিত হয় এবং স্বাধীনতার বিপক্ষীয়রা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্‌গার করে যেতে পারছে। আলোচিত গ্রন্থসমূহ এর একটি উদাহরণ মাত্র।

শুধু তাই নয়, প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ পর্বের পাকিস্তান প্রত্যয়ের বিভিন্ন উপাদান আবার যুক্ত হচ্ছে রাজনীতিতে। বাংলাদেশ আদর্শের বিপরীতে সে বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। এই আদর্শের নাম দেয়া যেতে পারে পাক-বাংলা আদর্শ। এ আদর্শের যারা ধারক তাদের বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু, বাংলাদেশ আদর্শ তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না হীনম্মন্যতার কারণে। কায়েমি স্বার্থ. যা সৃষ্টি হয়েছে গত ত্রিশ বছরে তা বজায় রাখতে গেলেও পাক-বাংলা আদর্শ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর প্রধান উপাদান পাকিস্তানে বিশ্বাস, ভারতকে ইহজগতের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা কিন্তু ভারতকে গোপনে সুযোগ দেয়া, ইসলাম ধর্মকে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে ব্যবহার করা, সামরিক আধিপত্যে বিশ্বাস ইত্যাদি। এই আদর্শের স্রষ্টা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা।

এদের পুনর্বাসিত করে জিয়াউর রহমান এই আদর্শের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন, পরে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তাঁকে অনুসরণ করেন। এঁরা এসব উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করেন কাকুল কালচার। কাকুলে যৌবনে তাঁরা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং তা মগজে গেঁথে গিয়েছিলো। সেটিরও আবার ক্লোন তৈরিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। পাকিস্তান আদর্শের স্রষ্টাদের অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের দলে নতুন ক্লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ক্লোনরা যে সবাই সে আদর্শে বিশ্বাসী তা নয়। তারা বিশ্বাসী কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখা, স্বার্থের নতুন মানচিত্র তৈরি করায়।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানি অ্যাকাডেমিশিয়ান পারভেজ আলীরালী হুদোভয় ও আবদুল হামিদ নায়ার 'পাকিস্তানের ইতিহাস পুনর্লিখন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন— "দেশ বিভাগের ৩০ বছর পর পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুনর্জাগরণে এটাই প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নয়, রাজনৈতিক মতলববাজিই এখানে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের চিরস্থায়ী সামরিকীকরণের জন্য চাই একজন চিরস্থায়ী শত্রু। অনেক কারণেই পাকিস্তানের অন্যান্য প্রতিবেশীরা এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। অপরদিকে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকবর্গ এই পারস্পরিক শত্রুতা ও উত্তেজনাকে একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখে আসছে।"

এখানে সৃষ্ট পাকি ক্লোনরা ঠিক একই কাজ করছে কি না সচেতন নাগরিক মাত্রই তা বিচার করতে পারবেন। গত বিশ বছরে এদেশে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিই এর প্রমাণ।

এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হলে হয়তো কিছু জানা যেত। কিন্তু হয়নি এবং তথ্যের স্বল্পতাও লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করা এখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরাই এগুলি নষ্ট করে ফেলেছে বা ফেলছে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর পর, এ. এস. এম. শামসুল আরেফিন 'রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা' প্রণয়ন করেছেন যার প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতাবিরোধী যারা আত্মজীবনী লিখেছেন এবং এখন পাক-বাংলা আদর্শের হয়ে কাজ করছেন তাদের গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ যার নাম—'রাজাকারের মন' বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, 'রাজাকারের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ'। সরল ভাষায়, একজন রাজাকার বা স্বাধীনতাবিরোধী কীভাবে বিচার করেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বা বাংলাদেশ? সে কি এখনও বিশ্বাস করে বাংলাদেশে? তার গ্রন্থে সত্যের ভাগ কতটুকু? কিইবা তারা লিখেছেন বা অধিকাংশই কেন লেখেননি, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এ গ্রন্থে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যাদের বই আলোচনা করেছি তাদের কেউ ছিল কোলাবরেটর, কেউ আল-বদর বা অন্যকিছু। কিন্তু আগেই বলেছি কাগজপত্রে বিভিন্ন বিভাগ থাকলেও মূলত এরা সব একই লক্ষ্যের অনুসারী। এই বিভাজন বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করতে পারে মাঝে মাঝে। আরেফিন নিজেও এ সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থ লিখতে গিয়ে। লিখেছেন তিনি—

"বিভিন্ন পরিচয়ে এদের ভাগে ভাগে না দেখিয়ে গড়পরতা সবাইকে 'দালাল' পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রয়াসের পেছনে একটা কারণও রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ যেটি তা হল, যে সব সরকারী কাগজের আলোকে এই তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে সেই সবের ছক অভিন্ন ছিল না। কোথাও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অপরাধের কারণ সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কোথাও শুধু বলা হয়েছে কোলাবরেটর অথবা দালাল অথবা পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী। কোন কোন তালিকায় তাদের পরিচয় এরূপও রয়েছে যে, "Arrested Razakars, All-Badars and Mujahids" অথবা, "Arrested on as they were either members of Razakars, Al-Badars, Al-Shams or Mujahid organisation and also supported the Pak Army in killing innocent public, looting, arson etc."

এ পরিপ্রেক্ষিতে এক কথায়, মোটাদাগে স্বাধীনতাবিরোধীদের আমি 'রাজাকার' নামে অভিহিত করেছি। রাজাকার, আগেই উল্লেখ করেছি, যারা বাংলাদেশে ছিল এবং মানুষ এই নাম ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত। জাহানারা ইমামের 'ঘাতক দালাল নির্মূল' আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি আরো পরিচিত হয়ে সাধারণের ভাষ্যে চলে আসে। হুমায়ূন আহমেদের একটি নাটকের সংলাপ ছিল—'তুই রাজাকার'। এসব কারণে, স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি সে আল-বদরই হোক বা দালালই হোক পরিচিত হয়ে ওঠে রাজাকার হিসেবে। জামায়াত ইসলাম, বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম অবশ্য সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা 'রাজাকার' ছিলেন না, ছিলেন 'রেজাকার'। হতে পারে রেজাকার শুদ্ধ, কিন্তু মানুষের কাছে অশুদ্ধ রাজাকারই পরিচিত। তাই আমিও রেজাকার-কে রাজাকারই লিখলাম।

৫

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনীর গুরুত্ব অস্বীকার করা হয় না। তবে, উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার আগে সামগ্রিকভাবে তার বিচার বিশ্লেষণ

করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে লুসিয়েন গোল্ডম্যানের মন্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, এই ধরনের রচনার অন্য একটি দিক আছে। তা হলো এই ধরনের রচনার মাধ্যমে আমরা কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social trait) জানতে পারি। আমরা জানতে পারি, লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থান নির্ধারণ করতে পারলেই একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক চালচলন, মূল্যবোধ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি রাজাকারদের আত্মজীবনীগুলি বিচার করেছি এবং গ্রহণ করেছি একটি সহজ পদ্ধতি। দেখাতে চেয়েছি লেখক কীভাবে ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করেছেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তা যথার্থ কি না সে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। যা সত্য নয় তা বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, রাজাকাররা বিরোধীদের সম্পর্কে অতিরঞ্জন বা সত্য নয় এমন বক্তব্য রাখলেও নিজের সহযোগীদের সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক তথ্য দিয়েছেন। এদের বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ তেমন নেই হেতু এ বর্ণনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

আগেই উল্লেখ করেছি এ ধরনের বইয়ের সংখ্যা খুব কম। বর্তমানে খন্ডে আমি যে-ক'টি বই সংগ্রহ করে আলোচনা করছি সেগুলি হলো—

১. মেজর (অব) মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন, *আমার দেখা বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ,* বুলবুল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৪৪, দাম ১৫০ টাকা।

২। মতিউর রহমান (সম্পাদিত), *সেকেন্ড থট অন বাংলাদেশ, রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টশন,* লন্ডন, ১৯৭৯, পৃঃ ১১৭।

৩। মোঃ আখতারউদ্দিন, *ন্যাশনালিজম অর ইসলাম! ইন্দো পাকিস্তান এপিসোড,* দিল্লী, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৩৭।

৪। আলহাজ্ব মোঃ মিছির উল্লাহ্, *স্মৃতির প্রেক্ষাপট,* মোঃ লিয়াকত আলী প্রকাশিত, মৌলভীবাজার, ১৯৮৭, পৃঃ ৯৮, মূল্য ২৫ টাকা।

৬

মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন একজন কনফিউজড ব্যক্তি। বৃটিশ আমলে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ায়

সহায়তা করেছিলেন এবং বাঙালিদের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে তাও তিনি অনুধাবন করেছিলেন। অন্তত তাঁর লেখা তা-ই বলে। অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন, নিজ গ্রামে জনহিতকর কাজ করেছেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অন্তিমে তার পরিচয় দাঁড়াচ্ছে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে সহায়তা করার জন্য গঠিত শান্তি কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রাজাকার ছিলেন।

কেন তিনি শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তার একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার সঙ্গে অন্য রাজাকারদের দেয়া ব্যাখ্যার কোনো অমিল নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসবো। তাঁকে 'কনফিউজড' বলছি এ কারণে যে তিনি নিজেকে বাঙালি মনে করেন। বৃহৎ বঙ্গ রাষ্ট্র কামনা করেন এবং পাকিস্তানি আমলেও বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে হিন্দু, বিশেষ করে বর্ণহিন্দু ও ভারতবিদ্বেষ তাঁর প্রবল। অন্য রাজাকাররা বাঙালি বা বাঙালিত্ব বা বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। আফসারউদ্দিনের আবার বাংলাদেশ মেনে নিতে আপত্তি নেই। এখানেই অন্য রাজাকারদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। কিন্তু, তাঁর লেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজাকারি চিন্তার মৌল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পার্থক্য নেই। রাজাকারি চিন্তার মৌল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশ হিসেবে ভারত এবং সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সম্পর্কে বিশেষ কিছু ধারণা। আফসারউদ্দিনের লেখায় সেই ধারণা-ই বারবার ফিরে ফিরে এসেছে।

আফসারউদ্দিন তিনটি বই লিখেছেন। 'আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ', 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আমার সৈনিক জীবন' এবং 'আমার দেখা বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।' বই তিনটির মধ্যে শেষোক্তটিই আমাদের বিচার্য। আফসারউদ্দিন ফাউন্ডেশনের পক্ষে বুলবুল প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করেছে ১৯৯৩ সালে। ২৪৪ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ১৫০ টাকা।

মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন কেন বইটি লিখেছেন ? কারণ, তাঁর "স্মৃতিপটে সঞ্চিত দীর্ঘ প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর এই উপমহাদেশের তিন দেশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মধ্যে যাহা আমার স্মরণে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে তাহা এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছি।" অর্থাৎ সব সত্য তাঁর কাছে সত্য নয়, যা তাঁর কাছে সত্য মনে হয় সেটাই সত্য। তবে এটাও তিনি বলেছেন, কারো কাছে সত্য যদি অন্যভাবে প্রতিভাত হয় তা হলে তিনি তা অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

বইয়ে তিনি আর্য আমল থেকে এরশাদ আমল পর্যন্ত 'সত্য' ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন এবং যে যে ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত তার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বইটি সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, স্মৃতিকাহিনীও নয়, দুইয়ের

মিশ্রণ। তিনি পাঠকদের উদ্দেশে বলেছেন, বইটি পড়ে "তারা যেন বিবেচনা করেন আমার লেখাগুলি ঐতিহাসিক সত্য ও যুক্তিযুক্ত হলো কিনা।"

ঠিক আছে, আমরা সে বিচারে যাবো। তবে সে বিচারের আগে আরো দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই, তা হলো তাঁর লেখার ধরনটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

বইয়ের শুরুতে 'প্রকাশকের কথা'য় আফসারউদ্দিনের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ মুজাহিদ বাহিনীর একটি প্রচারপত্র (১৯৮৯) উদ্ধৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় ১৯৮০ সালে এক 'মহতী জনসভায়' এ বাহিনী গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল চারটি—

* "বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়ত ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, জুলুম ও শোষণ বন্ধ করা।

* বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করণে জিহাদ করা।

* রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে ভ্রাতৃপ্রতিম আফগান মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করা।" এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

দীর্ঘ এই প্রচারপত্রে উদ্দেশ্য বিবৃত হওয়ার পর দেখা যায় বাকি সব বক্তব্য ভারতের বিরুদ্ধে। মুজাহিদ বাহিনীর নাম ভারতবিধ্বংসী মুজাহিদ বাহিনী দিলে তা আরো যুক্তিযুক্ত হতো।

প্রচারপত্রের মূল বক্তব্য হলো, ভারত তার প্রতিবেশী সব রাষ্ট্রকে 'তাঁবেদার রাষ্ট্র' করতে চায়। বাংলাদেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায়। "এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু গুপ্তচর ও গেরিলাবাহিনী তৈয়ার করেছে। দিল্লী সরকারের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই এই গেরিলা বাহিনী পরিকল্পনা মোতাবেক তৎপরতা শুরু করে দিবে। খুব সম্ভব প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নরহত্যা, লুটতরাজ ও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার জন্য রিক্রুট পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তারপর সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার বিষয়বস্তু তৈয়ার করবে।"

দেখা যাচ্ছে, রুশ আগ্রাসন বা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসন ঠেকানোর চেয়ে কল্পিত ভারতের আগ্রাসন ঠেকাতে মুজাহিদ বাহিনীর 'সর্বাধিনায়ক' মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন উৎসাহী ছিলেন। তাঁর চারটি "হুঁসিয়ারী"র মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

"সকল দল ও দেশপ্রেমিক জনগণকে ভারতীয় আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।"

খুব সম্ভব নব্বইয়ের দশকে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা এনডিপি নামে একটি দলও গঠন করেছিলেন। বইয়ের শুরুর দিকে সে দলেরও একটি প্রচারপত্র সংকলন করা হয়েছে। এ প্রচারপত্রের (১৯৯২) মূল বক্তব্য—

"আপনারা যারা স্বাধীন বাংলাদেশের আশেপাশে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের নিকট আমাদের প্রস্তাব আসুন, স্বাধীনতাহীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে আপনাদের রাজ্য কয়টি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যোগ দিন। আমরা বাংলা ভাষাভাষী সকলে মিলে এক স্বাধীন, সাবভৌম, অখণ্ড শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহাবাংলাদেশ গঠন করি। দুনিয়ার বুকে বাংলা ভাষাভাষীদের এক মহাজাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এপার বাংলা, ওপার বাংলা, সকল বাংলা লীন হোক এক মহা বাংলাদেশে।"

ভারতীয় আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য খুব সম্ভব এই কৌশল। এবং আরো ঘোষণা করেছেন— "আমরা যদি হিন্দু, মুসলিম ও বৃটিশ আমলে সকল ধর্মাবলম্বি (হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান) একত্রে সুখে-দুঃখে এক বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করতে পেরে থাকি, তবে আজও পারব। কোন স্বার্থান্বেষীর বাধা আমরা মানবো না।"

উত্তম বক্তব্য। বেশ সেক্যুলার সেকুল্যার মনে হয়। তা হলে, দেখা যাক ইতিহাস বর্ণনাটা তিনি কীভাবে করেছেন। তবে, এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, 'গ্রন্থকারের আরজ' এ তিনি জানিয়েছেন, যে নতুন বাংলাদেশ তিনি গঠন করতে চান সেখানে "দেশরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হবে।"

রাজাকারদের সামরিক বাহিনীপ্রীতি একটি ঐতিহ্য। এর কারণে, পাকিস্তান আমলে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে একটি মিথ গড়ে তোলা হয়েছিলো সাধারণ মানুষকে দমিত রাখার জন্য। যেমন, একজন পাকিস্তানি সৈন্য চারজন ভারতীয় সৈন্যের সমান। এই ইমেজ সৃষ্টি করতে গিয়ে এ ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে পাকিস্তানে ওপরে আল্লাহ্, নিচে মিলিটারি। এই ধারণা বলবৎ থাকায় পাকিস্তান কী ধরনের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তা পাঠকমাত্র-ই জানেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে, পাকিস্তানিদের মতোই এক দাসজাতির বিকাশ হতো। রাজাকাররা যা চেয়েছিল, যা তাদের কাম্য নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়। এ কারণে এখনও দেখা যাবে, রাজাকারি চিন্তার মানুষমাত্রই 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর গ্রাহক যা পাকিদের মুখপত্র। এবং ১৯৭১ সালের পর আজ নতুন শতাব্দীতে এসেও দেখা যাচ্ছে প্রাক-১৯৭১-এর মতো বাংলাদেশের মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে সুস্পষ্ট দুটি মতাদর্শে।

৭

বইয়ের শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে, লেখক তাঁর জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থে। কিন্তু, আসলে তা নয়। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস বর্ণনা করতে চেয়েছেন। বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা বর্ণনা করেছেন। এই ইতিহাস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ইতিহাসকে বিচার করেছেন।

'প্রাচীন ভারতের কিছু কথা'য় তাঁর মতামত এরকম—

"১. সেই আর্যদের আমলেও দেখা গেছে যে ভারত বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল তারা কখনও পূর্ণ ভারতকে এক রাষ্ট্রের অধীন করতে পারেনি যদিও তারা ধর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছিল।"

এই অদ্ভুত মন্তব্য কী কারণে ? কারণ আর কিছুই নয়, তিনি দেখাতে চেয়েছেন ভারত সবসময় বিভক্ত ছিল এবং বিভক্ত থাকবে। থাকুক, আর কী রাজ্য ছিল তখন ভারতে ? আর্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু হলে বাকিরা কী ছিল ? হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কি আর্যদের থেকে ?

২. "মিথ্যা প্রচারে ভারতীয় আর্যরা পৃথিবীর গুরু।"

এই মন্তব্যের কারণ, মহাভারত। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে যে, ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার। এক ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থসমূহকে খুব কমই বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করলে নিজের ধর্মের জোর থাকে কই ?

ছয়পৃষ্ঠার মধ্যে কোম্পানি আমলে চলে এসেছেন লেখক। এবং অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'কলিকাতায় রাজধানী হিন্দুদের পোয়াবারো।' কেন এ শিরোনাম, বোঝা দুষ্কর।

'ঢাকায় ইরেজদের হত্যাকাণ্ড' সম্পর্কে বক্তব্য–

৩. "মুঘল আমলে তা হলে দেখা যায় কি বিপুল সংখ্যক মুসলমান তখন ঢাকায় ছিল। তা না হলে এতগুলি বিরাট মসজিদ ও ঈদগা নির্মাণের প্রশ্নই আসত না,... এখন প্রশ্ন হলো এই যে, বিরাট ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তাতে সেই মোঘল আমলের জনগোষ্ঠীর বংশধরদের পুরনো শহর ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কেন ? কারণ, সেই আমলের সকল মুসলমানদের ইংরেজ ও তাদের দালাররা শত্রু মনে করত। এ জন্য তাদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার সাক্ষী পুরানো ভিক্টোরিয়া পার্ক। বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক। যেখানে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে বৃটিশরা ফাঁসি দিয়েছে। যা-ও বা কিছু লোক বেঁচে ছিল তাও প্রাণ ভয়ে শহর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে গেছে।"

মোঘল আমলে ঢাকায় লোকসংখ্যা কতো ছিল এবং কোন ধর্মের কতো ছিল সে সম্পর্কে আফসারউদ্দিনের কোনো ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। আর ভিক্টোরিয়া পার্কে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো দশজনকে।

৪. হিন্দুরা "ভারতকে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত (পণ্ডিত নেহেরু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) পরে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে (ইন্দিরা গান্ধী যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) ভারত উপমহাদেশকে তৃখণ্ডিত করা হলো, ভারত উপমহাদেশ আরও কত খণ্ড হয় তা ভবিষ্যতই বলতে পারে।"

অর্থাৎ, ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো মুসলমানদের কারণে নয়। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বা বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেনি। কারণ, পাকিস্তান তো ভেঙেছেন ইন্দিরা গান্ধী।

"তা হলে ইতিহাসের বিচারে কাদের লাভ হলো ? ভরতীয় বাংলা ভাষাভাষীদের না বাংলাদেশীয়দের ?" এ প্রশ্নের পর তাঁর সিদ্ধান্ত হলো—

৫. "মহা বাংলাদেশ কায়েমই ভারতীয় বাঙ্গালীদের বাঁচার উপায়—

তবে এখনও উপায় আছে আমরা যেমন পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হয়েছি তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের আশেপাশে যত বাংলা ভাষাভাষী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে যেমন পশ্চিমবঙ্গ, সাবেক কুচবিহার, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব বাংলা ভাষাভাষী সকলে মিলে ভারত থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে একত্রে মিলেমিশে এক অখণ্ড ও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী মহা বাংলাদেশ গঠন করা যায়। আবারও দুনিয়ার বুকে সকল বাংলাভাষাভাষীদের নিয়ে এক মহাজাতি আসলে সুপ্রতিষ্ঠ করা যায়। যদি হিন্দু মুসলিম ও বৃটিশ আমলের সকল ধর্মাবলীরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান) একত্রে সুখে দুখে এক বাংলাদেশের মাটিতে বসবাস করতে পারে তবে আজও পারবে।"

তার পরই আবার বলছেন "আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পশ্চিম বাংলার ভাইবোনেরা আমাদের যে সর্বতোরকম সাহায্য করেছেন, প্রায় ১কোটির মত উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের খাদ্য বাসস্থান সহ সার্বিক সাহায্য করেছিলেন তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আজ যদি সীমান্তের ওপারের বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের প্রয়োজন হয় তবে বাংলাদেশ ততোধিক যথা সর্বস্ব দিয়ে বাঙ্গালীদের কাছে এ দেশের ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না।"

যিনি বিশ্বাস করেন হিন্দুদের জন্য সর্বনাশ হয়েছে তিনি আবার হিন্দুদের বাংলাদেশে আনতে চাচ্ছেন কেন ? এ হিন্দুভীতির কারণ যদি তাতেও ভারত আরও খণ্ডিত হয়।

৬. "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতীয় কংগ্রেস যতই দাবী বা গর্ব করুক, আসলে ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করেছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি— আজাদ হিন্দ ফৌজ। ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৭. ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান হলো। ভারতীয়রা তো খুব খুশি (যেন মুসলমানরা খুশি হয়নি)। তাই মাউন্টব্যাটেন "ও বৃটিশ রাজকে খুশী করার জন্য একজন স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিককে প্রথম গভর্ণর জেনারেল না করে বরং আরো কিছুদিন বৃটিশের গোলামী করবার খুশীতে ভারতে বৃটিশ রাজের শেষ প্রতিনিধি বৃটিশ সন্তান লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল করে আরও কিছুদিন বৃটিশের সেবাদাস প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ করা হলো। আরও কিছু কারণ থাকতে পারে যে, প্রায় হাজার বছর মুসলমান ও খৃষ্টানের নিকট পরাধীন থেকে রাজ্য শাসনে ভারত তাদের আরও কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা মাউন্টব্যাটেনকে রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রায় এক বছর রেখে দিলেন— তারপর ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সাথে লেডি মাউন্টব্যাটেনের একান্ত ঘনিষ্ঠতার কারণে হয়ত মাউন্টব্যাটেনকে আরও কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে রাখা পণ্ডিত নেহেরু প্রয়োজন মনে করেছিলেন তাই স্বাধীন ভারতের ইংরেজ নাগরিক প্রায় ১ বছর ভারতের রাষ্ট্র প্রধানের কার্য পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।"

বোঝা যাচ্ছে অনগ্রসর পাকিস্তানের জন্য 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত' কারো কোন দরকার ছিল না কেননা তারা মুসলমান। আফসারউদ্দিন হয়ত জানেন না, পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সেনাপতি ও পূর্ববঙ্গের গভর্নর ছিলেন বৃটিশ। পঞ্চাশ সাল পর্যন্তও পাকিস্তানে অনেক বৃটিশ প্রশাসক কাজ করে গেছেন।

পাকিস্তান হওয়ার পর মেজর গনির নেতৃত্বে তারা কয়েকজন মিলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করেন। "মাঝে মাঝে ভাবি", লিখেছেন আফসারউদ্দিন, "আমরা গুটি কয়েক বাঙ্গালী অফিসার যদি সেদিন পাকিস্তান আমলে (১৯৪৮ সন) এই ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা না করতাম তবে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধে কারা নেতৃত্ব দিত ? মেজর গনি অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের পিতা (পাপা টাইগার) তাই আমিও এই রেজিমেন্টের চাচা (চাচা টাইগার) বলে গর্বিত হতে পারি।"

আফসারউদ্দিন জানিয়েছেন, "পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক চাকুরিরত অবস্থায় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হিসেবে সারাটা পকিস্তান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, বহু পাঠান,

বেলুচি, সিন্ধু ও পাঞ্জাবীদের মনে বাংলাদেশীদের জন্য আফুরন্ত সম্মান, সহমর্মিতা ও মায়া মহব্বত রয়েছে।"

ভাবি, এতো মায়া মহব্বত ১৯৭১ সালে কোথায় উবে গেল ? পাঠান, বালুচি, পাঞ্জাবি সৈন্যরা এসে পাখির মতো কেন বাঙালিদের গুলি করে মারলো ?

১৯৬০ সাল পর্যন্ত এভাবে প্রথমে পুরো উপমহাদেশ তারপর পাকিস্তানের ইতিহাস বর্ননা করেছেন আফসারউদ্দিন। ১৯৩০-এর আগের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারনা ভাসাভাসা। কিন্তু সেই জ্ঞান নিয়েই বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে গেছেন।

এই সমস্ত মন্তব্য তুলে ধরে যে, তিনি ছিলেন কনফিউজড। ১৯৪৭-এ বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান চেয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমানও সেজন্য আন্দোলন করেছেন, তাতে অস্বাভাবিকতাটি কী ? যাদের মোহভঙ্গ হয়েছে তারা বাংলাদেশ আন্দোলন করেছেন। আফসারউদ্দিনের মোহভঙ্গ হয়নি। নাও হতে পারে, এবং এ কারণে তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানরক্ষায় এগিয়ে গেছেন। মুশকিল হচ্ছে অফসারউদ্দিন সেটা মানতে রাজি নন। তিনি ভারতকে একবার হিন্দু রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেন আবার পশ্চিমবঙ্গকে আহ্বান জানান পূর্ববাংলার সঙ্গে যুক্ত হতে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি পরস্পরবিরোধী মনে হলেও মূল তত্ত্বটি এক। তা হলো, ভারতও হিন্দু। ভারত পাকিস্তান ভেঙেছে। অর্থাৎ হিন্দুরা মুসলমানদের হারিয়েছে। সুতরাং হিন্দুদের হারাতে হবে। অর্থাৎ ভারতকে ভাঙতে হবে। সেজন্যই এই উদাত্ত আহ্বান।

৮

১৯৬২ সাল থেকে 'আমার জীবন'-এর উল্লেখ করেছেন আফসারউদ্দিন। এ বছর তিনি পেনশন নেন এবং তাঁর ভাষায়, "নির্দলীয় ভাবে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যোগ দেই।" এর একটি হলো পূর্ব পাকিস্তান প্রাক্তন সামরিক সমিতি গঠন।

এসব প্রচেষ্টার কারণে নিজ এলাকায় পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে বরিশালের হিজলা মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌর নদী ও উজিরপুর থেকে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পরপরই নিজের জেলার বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা তুলে ধরতে লাগলেন। এ সম্পর্কিত কিছু পেপার-

কার্টিংও দিয়েছেন। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানাতে থাকেন। ২৮ মার্চ ১৯৬৩ সালে 'পাকিস্তান অবজারভার' লিখেছিলো, আফসারউদ্দিন জাতীয় সংসদে বলেছিলেন- "East Pakistan were being treated like Negroes in America in respect of military training by the Governament."

এরপর হঠাৎ দেখি তাঁর একটি উপশিরোনাম 'পাকিস্তান ভাঙ্গবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরাই দায়ী', বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে বৈষম্যই তাঁর মনে এ ধারণার সৃষ্টি করেছিলো। সামরিক বাহিনী সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন সংসদীয় বক্তৃতা "পূর্ব পকিস্তানের শিক্ষিত মহলে ও সামরিক বাহিনীর নিকট দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। আমার নামও এই ভাবে আমার অলক্ষ্যে বাংলাদেশে গণমনে ছড়িয়ে পড়ল।" শুধু তাই নয়, "১৯৬৪ সনের শেষদিকে বা ১৯৬৫ সনের প্রথম দিকে ঢাকা ইইনিভার্সিটির উপরের ক্লাসের একটি ছেলে এসে আমাকে বলল যার সারমর্ম এই ভাবে বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। এজন্য ছাত্র ও যুবকদলের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। ঐ ছাত্রটি আরো বললো যে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডিপুটি হাইকমিশন তাকে কথা দিয়েছেন, এই মুক্তিযুদ্ধে যত অস্ত্র এবং টাকা পয়সা প্রয়োজন হবে তা ভারত সরকারের পক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন তার ব্যবস্থা দায়িত্ব নিবে। এখন তাদের দরকার শুধু এই বিদ্রোহ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন উপযুক্ত প্রাক্তণ সামরিক অফিসার। তাই এই নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমাকেই তারা মনে মনে বেছে নিয়েছে।"

আফসারউদ্দিনের মনে হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রস্তুত নয়। তা ছাড়া তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না যে "ভারত সরকার এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে আরও ছোট ও দুর্বল করা।"

এর আগে তিনি বলছেন পাকিস্তান ভাঙার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী। পাঁচ পাতা পরে বলছেন, ভারত পাকিস্তান ভাঙ্গতে চায়।

১৯৬৬ সাল থেকে আফসারউদ্দিন গুজব শুনছিলেন যে, নৌবাহিনী অফিসার ও জোয়ানরা স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিচ্ছে। "পূর্ব পাকিস্তানের স্বধীনতার জন্য দাবানলের মতন সকল জাহাজে এবং করাচী বন্দরের স্থায়ী নৌঘাঁটিতে বাঙ্গালী অফিসার ও জোয়ানদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলছে।"

পাকি সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঘোষণা ও লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেনকে আসামি করায় এই গুজবের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তাঁর মতে, "বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব খতম করার উদ্দেশ্যে" শেখ মুজিবকে মামলার ১নং আসামি করা হয়। যে কারণে "বাঙ্গালীদের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক হিসেবে তিনিও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন আর এই ষড়যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মূল নায়ক লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নাম সাধারণ একজন বিদ্রোহীর সারিতে স্থান দেন।" মোয়াজ্জেম আফশোস করে বলেছিলেন "প্রকৃত বিদ্রোহ ও আগরতলা ষড়যন্ত্র নিজের জীবন বিপন্ন করলাম, আর ভাগ্যের কী পরিহাস এই ষড়যন্ত্রের ফল পেল শেখ মুজিবর রহমান।" ২৫ মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেনকে গুলি করা হয় আর শেখ মুজিবকে বন্দি। "এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারেও কমান্ডর মোয়াজ্জেমের ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব সত্য বলে প্রতিপন্ন হলো।"

সবই ঠিক আছে। কিন্তু, প্রশ্ন হলো ১৯৬৬ সাল থেকে সবাই আগরতলা ষড়যন্ত্রের গুজবের কথা জানে অথচ পাকিস্তান সরকার দু'বছর পর কেন ব্যবস্থা নিলো ? ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত নয় কি ? সরকার শেখ মুজিবকে আসামি করে ফায়দা লুটতে চেয়েছিলো সেটি ঠিক হতেও পারে এবং বঙ্গবন্ধু এর সমগ্র নেটওয়ার্কের মূলে নাও থাকতে পারেন কিন্তু মোয়াজ্জেম হোসেন নায়ক ছিলেন সবকিছুর এটি কল্পনাশক্তিরও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। তিনি অন্যতম ছিলেন অবশ্যই কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানের মতো সামরিক বাহিনীতে এতো নিম্ন পর্যায়ের কয়েকজনকে দিয়ে ক্ষমতা দখল সম্ভব ছিল না। এর পেছনে দরকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শক্তি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের একটা যোগাযোগ হয়ত ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের সেই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ছাড়া কারো পক্ষে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না। আর মোয়াজ্জেম হোসেন আফসারউদ্দিনকে সে খেদ জানিয়েছিলেন কি না আজ তার সত্যতা নিরূপনো করার কোনো উপায় নেই। আর বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭১ সালে হত্যা সম্ভব ছিল না কারণ, তা হলে নয়মাস আর দীর্ঘায়িত হতো না মুক্তিযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ তখনই হয়ত ব্যবস্থা নিতো।

আবার ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকেই, জানিয়েছেন আফসারউদ্দিন, ছয়দফা ছয়দফা বলে চিৎকার শুরু হলো, লিখেছেন তিনি, "আমার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার বহু শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট আমি জানতে চেয়েছিলাম ৬ দফা কী তা তারা জানেন কিনা ? আমি অশ্চর্য হলাম শুধু আমার এলাকার শিক্ষিত লোকই নয় মূর্খ লোকতো দূরের কথা রাজধানী ঢাকার বহু শিক্ষিত লোকও ৬ দফা কী তা জানতেন না। তবুও

প্রচারের জোরে ও মুখে তারা ৬ দফা ৬ দফা বলে চিৎকার দিতেন ও সমর্থন করতেন।"

তিনি বলতে চেয়েছেন হুজুগটাই ছিল বড় কথা। এবং মানুষজন ৬ দফা না বুঝে প্রচারঝড়ে পড়েছে। কিন্তু, ৬ দফার ৬ দফা মুখস্থ বলতে হবে এমন কোনো দিব্যি কাউকে দেয়া হয়নি। মূল বিষয় ছিল এর নির্যাসটি কী বা মানুষ তা বুঝেছে কি না ? মানুষ জানতো ৬ দফা মানে স্বায়ত্তশাসন। সেই বোঝাই ছিল যথেষ্ট। এবং মানুষ তা অনুধাবন করেছিলো দেখেই রাস্তায় নেমেছিলো।

এক দিকে শেখ মুজিব আর অন্য দিকে ভুট্টো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। আইয়ুব খান, তিনি উল্লেখ করেছেন, অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখল করেছিলেন কিন্তু "এত জনহিতকর কাজ করেও দেশের উভয় অংশের জনগণের বিরোধিতা দেখে মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে সর্বদলের নির্বাচিত নেতার নিকট শাসনভার অর্পনের জন্য গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন।"

বস্তুত আইয়ুব খানের গিবত গায়নি কোনো রাজাকারই। কারণ, আইয়ুব ছিলেন তাদের বেনেফেক্টর। এদের একটা অংশ আইয়ুব আমলে মৌলিক গণতন্ত্রের কারণে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। সরাসরি ভোটে তারা কখনও নির্বাচিত হতেন কি না সন্দেহ।

কীভাবে সত্য অর্ধসত্য মিলিয়ে বক্তব্য রাখতে হয় রাজাকাররা তা জানে। উপরের উদ্ধৃতাংশ তার প্রমাণ। আইয়ুব খান অগণতান্ত্রিক পথে এসেছিলেন এটি দিবালোকের মতো সত্য কিন্তু পুরো অন্যায়টি ঢেকে দেয়া হয় একথা বলে যে তিনি অনেক 'জনহিতকর' কাজ করেছিলেন। এ কারণে, ক্ষুব্ধ হয়ে "শান্তিপূর্ণভাবে" "বিনা রক্তপাতে" শাসনভার হস্তান্তর করতে চাইলেন। এর কোনোটাই ঠিক নয়। 'জনহিতকর' কাজ করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব ফলে এটি বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়। ধরা যাক একজন শিক্ষকের কথা। তাঁর কাজই হবে পাঠদান। এখন যদি প্রশংসা করা হয় তিনি পাঠদান করেছেন বলে তা হলে বিষয়টি কী দাঁড়ায় ? যেন এটি তাঁর কৃতিত্ব, পাঠদান করা না হলে তো শিক্ষক হিসেবেই তিনি স্বীকৃত হবেন না।

তা ছাড়া, আইয়ুব খান শান্তিপূর্ণভাবে বা রক্তপাত ছাড়া ক্ষমতা ছাড়েন নি। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছেন। পারেন নি। এ প্রসঙ্গে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের বিষয়টি চেপে গেলেন কেন আফসারউদ্দিন ? ঢাকাসহ সারা দেশে কি তখন লাশ পড়েনি ?

এরপর হলো গোলটেবিল বৈঠক। সেখানে আইয়ুব খান নাকি শেখ মুজিবকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু মুজিব তাতে রাজি হননি। শুধু

তাই নয়, রাতে একা নৈশভোজে "৬/৭ ঘন্টা কাটিয়েছেন"। এরপর ২৪ মার্চ ১৯৬৯ সালে একনায়ক আইয়ুব ক্ষমতা ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে "প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য" আফসারউদ্দিন পিন্ডি যান। সেখানে এক বাঙালি মেজরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এর যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিবরণটি উদ্ধৃত করছি–

আফসারউদ্দিন ইসলামাবাদ যাবেন আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করতে। পিন্ডি এয়ারপোর্টে তাঁর পরিচিত এক 'পূর্ব পাকিস্তানী মেজর'-এর সঙ্গে দেখা। তিনি তাকে বললেন, "স্যার, আমাদের সিনিয়র বাংগালী অফিসারদের বর্তমান চীফ অব স্টাফ ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান রাওয়াল পিন্ডি আর্মি হেড কোয়ার্টারে একত্রে জমা করে অর্ডার দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে যাতে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদে নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা করে দৈনন্দিন ইয়াহিয়া খানের এডমিনিস্ট্রেশনকে পরামর্শ দেয়ার জন্য। ইয়াহিয়া প্রশাসন একান্তভাবে চেষ্টা করছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খান মিলে মিশে শাসনক্ষমতা হাতে নিতে পারে।"

যদি ভাবেন বিনা উদ্দেশ্যে এই গল্প ফাঁদা হয়েছে তা হলে ভুল করবেন। রাজাকারদের একটি থিসিস হলো, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে জিততে সাহায্য করেছিলেন যাতে দু'দলে মিলে ক্ষমতায় থাকতে পারেন। এই ইঙ্গিতটি আফসারউদ্দিন আগেই দিয়ে রাখলেন এই বর্ণনায়।

এরকম গল্প সৃষ্টি রাজাকাররাই করতে পারে। পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের অনেকের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি, এমনকী আলতাফ গওহরেরও যিনি ছিলেন আইয়ুবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কিন্তু, এ ধরনের গল্প কেউ উপহার দেন নি। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কেউ নির্বাচনে দাঁড়ায় এমন কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আফসারউদ্দিন এরপর আইয়ুব খানের সঙ্গে নৈশভোজ করেন। আইয়ুব তাকে জানান শেখ মুজিবকে তিনি শাসনভার নিতে বলেছিলেন– "আমিও (আইয়ুব খান) গোপন সূত্রে জানলাম যে শেখ মজিবুর রহমান ইতিমধ্যে দুইবার গোপনে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে নির্বাচনের পরে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট থাকবেন আর শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এই গোপন আঁতাতের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান আমার নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।"

কিন্তু, এটিই শেষ কথা নয়। আইয়ুব খান প্রিয় ছিলেন আফসারউদ্দিনের। আইয়ুব খানকে হটিয়ে দেয়া তাঁর খুব একটা ভালো লাগেনি। কেন আইয়ুব খানকে চলে যেতে হয়েছিলো তা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—

১. সিআইয়ের চক্রান্ত
২. ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চক্রান্ত
৩. "বিদেশী অর্থপুষ্ট ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের অপচেষ্টা"
৪. পাঞ্জাবীদের অপছন্দ কারণ আইয়ুব ছিলেন পাঠান।

রাজাকারদের চিন্তায় সবসময় ঘোরে চক্রান্ত এবং সব ঘটনার জন্য অন্তিমে দায়ী হয়ে দাঁড়ায় বিদেশী অর্থ অথবা সিআইএ বা র-এর ষড়যন্ত্র। কিন্তু, ইন্টারেস্টিং হলো, আইয়ুব খান আবার কবে পাঞ্জাবিদের স্বার্থবিরোধী কাজ করলেন? যা করেছিলেন তা তো পাঞ্জাবিদের স্বার্থেই করেছিলেন।

৯

আইয়ুব খান গেলেন, ইয়াহিয়া খান এলেন। ইয়াহিয়া এবং মুজিব আঁতাত করলেন। তাঁর ভাষায়—

"আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক আদেশ ছিল পরস্পর পরিপন্থী। তবুও ক্ষমতার ভাগাভাগির স্বার্থে আওয়ামী লীগ লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন করেনি। ক্ষমতা লাভের আশায় আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া খান বা তার লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের বিরুদ্ধে কোন প্রচার করেনি। ইয়াহিয়া খান সরকারও আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি যদিও তা ছিল পরস্পর পরিপন্থী। এই দু'মুখো নীতি অবলম্বন করে কিছুদিনের জন্য দু'পক্ষেই নির্বাচন প্রচারণা চলতে লাগল।"

এই আঁতাত আরো দৃঢ় করলো, তাঁর মতে, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়, "জিতবার জন্য ইয়াহিয়া খান পূর্বপরিকল্পিত মতে আওয়ামী লীগকে এবং এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে এই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করলেন।" সমস্ত ত্রাণসামগ্রী আওয়ামী লীগকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। সরকারি ত্রাণ ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আফসারউদ্দিন ১৯৭০-এর নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন।

"আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে— এর কোন কারণ বা যুক্তি ভোটাররা আমল দেয়নি। যদিও আমার অকাট্য যুক্তিমতে এই নির্বাচনের পরবর্তীতে পাকিস্তান ভেঙ্গেই গিয়েছিল।"

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিয়ে রেসকোর্সে শপথ নেওয়ালেন। শপথনামা বিশ্লেষণ করে আফসারউদ্দিন লিখেছেন— "উল্লেখ্য এই শপথনামায় দেখা যায় আওয়ামী লীগ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছিলেন স্বায়ত্তশাসন তাদের লক্ষ্য ছিল। বাংলা ও পাকিস্তানের জয় তাদের কামনা ছিল। নির্বাচিত সদস্যরা স্বাধীন বাংলা কায়েম করবার বা ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন শপথ নেয়নি। অথচ স্বাধীনতার পর আল্লাহকে বিসর্জন নিয়ে এই নির্বাচিত সদস্যগণই ভারতের অনুকরণে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের প্রথম গঠনতন্ত্রে (১৯৭২ সনে) জুড়ে দিল। তাদের নির্বাচন প্রচার পত্রেরও বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর ধর্মকে গঠনতন্ত্রে গায়েব করে দিল। জনগণ কখনও তাদের এই ক্ষমতা দেয় নি।"

আফসারউদ্দিনের এই চিন্তার কোনো মৌলিকত্ব নেই। কারণ, সব রাজাকারই বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে এই মন্তব্য করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা- এই শব্দটি তাদের গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

এর পরের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে মেজর আফসারউদ্দিন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের "আহ্বান জানান।" দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত পত্রিকার এই রিপোর্টটি তিনি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন— "আমার উপরিল্লিখিত বিবৃতির আবেদন যদি ইয়াহিয়া সরকার আমল দিত তা হলে হয়ত পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরূপ লেখা হত। বাংলাদেশের কয়েক হাজার লোক ১৯৭২ সনে [১৯৭১ হবে] পাক বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাত না, জুলফিকার আলী ভূট্টোর ফাঁসি হতো না। কোটি খানেক পূর্ব পাকিস্তানবাসী ভারতে সাহায্যপ্রার্থী শরনার্থী হতো না ইত্যাদি।"

এ মন্তব্যে হাসবেন না কাঁদবেন ? যেখানে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পার্টিকে পাকিরা পাত্তা দিতে চাচ্ছে না সেখানে ইসলামী গণতন্ত্র দল ও মেজর (অবঃ) আফসার! যাহোক তাঁর মন্তব্যের একটি শব্দ লক্ষ করুন— 'কয়েক হাজার'। মুক্তিযুদ্ধে মাত্র কয়েক হাজর নিহত হয়েছিলো পাকিদের হাতে ? একথা পাকিরা হরদম বলে, আফসারউদ্দিনও বলবেন তাতে আর সন্দেহ কী ? কিন্তু, সেটি বলছেন কৌশলে, অনেক বাক্যের ফাঁকে যেন সহসা চোখে না পড়ে কিন্তু লিখিত দলিল থেকে যায়।

পূর্বোল্লিখিত তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা যায়, জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে থাকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ সংবিধান রচনার, তা হলে তারা কি ইয়াহিয়া বা ভুট্টো বা পাকি জেনারেলদের ক্ষমতা দিয়েছিলো সংসদ অধিবেশন না ডাকার ? বঙ্গবন্ধু কেন ৭ মার্চের বক্তৃতা দিয়েছিলেন ? ২৫ মার্চের আগে কি স্বাধীন বাংলাদেশ রূপ পেয়েছিলো ? ২৫ মার্চ রাজাকারদের ধর্মপিতা পাকি জেনারেলরা যখন গণহত্যা শুরু করে তখন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না ইসলাম গেল গেল বলে পাকিদের পা ধরে বসে থাকবে, যেমন রাজাকারা থেকেছিলো ?

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আল্লাহকে বিসর্জন দেয়া— এই ধরনের বক্তব্য জ্ঞানপাপী ছাড়া কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় নেই, রাজাকারদের সবসময় তাদের ধর্মপিতাদের কথা বলতে হবেই এবং ধর্মের নামে মিথ্যা প্রচার করতেই হবে যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং সে সুযোগে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়। কারণ, রাজাকারদের মূল প্রপাগান্ডা লাইনটাই তাই।

তবে, আফসারউদ্দিন দেখা যাচ্ছে খুশি ছিলেন না টিক্কাখানের ওপর। "প্রথমতঃ তার নাম এমন অদ্ভুত যা নিজেই প্রকাশ করে দিবে যে খুব অশিক্ষিত ও নিম্নস্তরের পাঞ্জাবী মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে... ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে প্রমোশন পেয়ে লেঃ জেনারেল হয়েছে।" টিক্কা ও তিনি একসময় একই র‍্যাংকে কোয়েটায় এক বছর ছিলেন। এবং তিনি লক্ষ করেছেন— "লোকটা কোন দিন মদ খেত না ও পারত পক্ষে নামাজ ও রোজা ছাড়ত না।" তার মানে নিষ্ঠুর হলেও লোকটা খুব একটা খারাপ না। তিনি জানিয়েছেন, বেলুচিস্তানে 'নিষ্ঠুরতা' প্রদর্শনের কারণেই তাকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ করা হয়েছিলো। এ তথ্য অনেকেই দিয়েছেন। কিন্তু, খুব সম্ভব এটি ঠিক নয়। পাকিস্তানের প্রবীন রাজনীতিবিদ মাজারি লিখেছেন, ভুট্টোর সময় বেলুচিদের জাতীয়তাবাদী স্পৃহা দমনের জন্য টিক্কাকে নিয়োগ করা হয়েছিলো এবং সাফল্যের সঙ্গে টিক্কা সে কাজ সম্পন্ন করেছিলো।

তবে, মেজর আফসারের প্রশংসা করতে হয় এ কারণে যে ২৫ মার্চ ও শরণার্থীদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগে কোন মিথ্যা বিবরণ তিনি দেননি যা অধিকাংশ রাজাকার দিয়েছে। বা তাঁর মনে হয়েছে ঐ ধরনের বক্তব্য তাঁর বিবরণের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করবে।

২৫ মার্চের আগে তিনি উল্লেখ করেছেন, পাকিদের তৎপরতা দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো এরা হামলা করতে পারে এবং সে খবর তিনি পাঠিয়েছিলেনও শেখ সাহেবকে। ২৫ মার্চ আক্রান্ত হয় ঢাকা— "ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন হলগুলি আক্রমণ করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বহু ঘর বাড়ি আগুন

দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।.... এভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থা সৃষ্টি করে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়।" শরণার্থীরা বাংলা দেশ ত্যাগ করতে থাকে। "বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা স্টেটের জনগণ অকৃপণ ভাবে এইসব শরণার্থীর আশ্রয়দান ও সেবাযত্ন করেছেন। তা চিরদিন বাংলাদেশী জনগণ কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখবে। ভারত সরকার খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করেছে— তা আমাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে। হঠাৎ, এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পশ্চিম বঙ্গে আগমন যার মধ্যে অসংখ্য মা-শিশু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও এর মধ্যে বহু শিশুবৃদ্ধ বৃদ্ধাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।"

কিন্তু, হঠাৎ আফসারউদ্দিনের মনে হয়েছে, এটাতো ভারতের প্রশংসা হয়ে গেলো। তখনই আবার তাকে অন্যকথা বলতে হচ্ছে। নিচের উদ্ধৃতিটুকু দেখুন—

"ভারতের জনগণ ও সরকার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের যথাসাধ্য প্রাণ ঢালা সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন কিন্তু দিল্লী সরকার (ইন্দিরা গান্ধী সরকার) ও ভারতের বর্ণবাদী হিন্দুদের মনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিকিমের মত একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র করা... এই বিশ্বস্ত রক্ষী বাহিনী দেশ শাসন করবে এবং সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দিবে। প্রকৃত প্রিয় এবং দীন ইসলামের অনুসারীদের নির্মূল করবে। রক্ষীবাহিনীর স্বাধীনতা উত্তর কার্যকলাপ আমার এই উক্তি বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে।"

প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় কি মুসলমান রাজত্ব ছিল? অদ্ভুত যুক্তি। প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় কে? যারা পাকিস্তান চায়। "দীন ইসলামের অনুসারীদের নির্মূল করতে হবে?" দীন ইসলামের অনুসারী কারা? যারা বাঙালিদের হত্যা ও ধর্ষণে সহায়তা করছে?

১০

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু 'পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের স্বার্থ কী' আলাদা (এই) শিরোনামে এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, সীমান্ত প্রতিরক্ষা ও ব্যবসার কারণে ভারত চায় পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হোক। এজন্য "ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ও তাঁবেদার রাষ্ট্রে

পরিণত করতে চেয়েছিল, চাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও চাইবে। আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে যে, স্বাধীনতার পরে পরেই ভারতীয় বেসামরিক নৌযান আমাদের এই তিন নদী ব্যবহার করে সোজা রাস্তায় অতি অল্প খরচে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ আসামে, মনিপুর, মিজোরাম, আগরতলা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় প্রভৃতি স্থানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এবং বাংলাদেশের জুট বোর্ডকে ঢাকা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিল। পরে অবশ্য স্বাধীনতা ও দেশপ্রিয় জনগণের চাপে জুট বোর্ড আবার ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ জলপথ যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।"

পাকিস্তানের "অন্ধ স্বার্থপরতা ও একগুয়েমির" ও ভারতের "স্বার্থোদ্ধারের" জন্য বাংলাদেশ হলো। এখানে মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কি বাংলাদেশ চায়নি ? বাংলাদেশের মানুষ না চাইলে কি কিছু হতো ? মানুষ যা চেয়েছে তা-ই হয়েছে। এর প্রমাণ তার শেষোক্ত উক্তি। যদিও যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তার সত্যাসত্য বলতে পারবো না। তবে, এটি নিশ্চিত যে জুট বোর্ড দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়নি।

যাহোক ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলো। যৌথবহিনীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু যুদ্ধ তাঁর মতে, "উভয় পক্ষের সাহসিকতার সাথে সংঘটিত হয়েছিল।" লক্ষ করুন, পাকি বাহিনীর সাহসিকতা তিনি প্রমাণিত করতে চান যদিও তারা পরাজিত। কিন্তু পরাজয়টা কেন ?" যেহেতু নৈতিক বল, গোলা বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী করার সুযোগ ভারত ও মুক্তি যোদ্ধাদের অনুকূল ছিল তাই সকল যুদ্ধ ক্ষেত্রে যৌথভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত হতে লাগল।"

অর্থাৎ, না হলে পাকিরাই যুদ্ধ জিততো যা তিনি বা তারা চেয়েছিলেন। তাঁর এই মনোভাবটি অপ্রকাশিত থাকে না। এ পর্যায়ে সবশেষে তিনি লিখছেন— "ভারত দেখতে চায়, যেহেতু ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর নিকট পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে সেহেতু এই বিজয় ভারতের একক ব্যাপার। মুক্তি যোদ্ধাদের ভূমিকা ভারত গৌণ বলে প্রতীয়মান করতে চায়।"

শুধু তাই নয়, "এই আত্মসমর্পণ দলিলে কোথাও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা তার প্রতিনিধির কারও নাম উল্লেখ নাই। পাকবাহিনী পাকিস্তান নাগরিক, বৈদেশিক নাগরিকের রক্ষাণবেক্ষণ বাংলাদেশের ভুখণ্ডে ভারতীয় কমান্ডিং ইন চীফের উপর বর্তিত। এখানেও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা কোন প্রতিনিধির নামও দেখা যায় না। এই আত্মসমর্পণ পত্রটি মুক্তি যুদ্ধের কোন গৌরব বা স্বীকৃতি বহন করে না।"

প্রায় সব রাজাকারই ১৬ ডিসেম্বর সম্পর্কে একই বক্তব্য পেশ করেছে। সুতরাং, আফসারউদ্দিন এর ব্যতিক্রম হবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ এতো যে রক্তপাত, এতো যে শহীদ তার কোনো 'গৌরব বা স্বীকৃতি' রাজাকাররা দিতে নারাজ। কিন্তু দেশ তো স্বাধীন হয়েছে। সেটা স্বীকার করতে হয়। তাই লেখেন, "সে যা হোক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন্ হলো।" মন্তব্যটি করতে বেশ কষ্ট হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

এরপর তিনি যে কটি বাক্য লিখেছেন তাতে আবার বিভ্রান্ত হতে পারেন পাঠক। লিখেছেন তিনি, "আমরা তখন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। এই ঐতিহাসিক দিবসটি আমাদের ও আমাদের উত্তরসুরীদের গর্ব ও আনন্দের দিবস বলে বিবেচিত হবে। এই দিবসটিতেই প্রকৃত বাংগালী জাতির, বাংগালী জাতীয়তাবাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল, বিশ্বমানব সমাজে বাংলাভাষাভাষীদের একটি মাত্র স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

মনটা খুশি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, হঠাৎ তিনি একথা লিখবেন কেন ? কারণ, একটা অবশ্যই আছে। সেটি পরের অনুচ্ছেদে বোঝা যায়—

"ঢাকা মহানগরের মধ্যে অবস্থিত মুক্তিবাহিনী যাদের আমি কৌশল করে পাকি-বাহিনীর হাত থেকে, নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছি, মহাসংকটের সময় খাদ্য যোগিয়েছি তারাও আজ আত্মপ্রকাশের মহাআনন্দে উৎসব করছে। আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে আকাশের দিকে শত সহস্র গুলি ছোঁড়ে আমাকে তাদের সামরিক সালাম ও ভক্তি জানাল।"

কী বুঝলেন ? এতোক্ষণ আফসারউদ্দিন যা বলছিলেন তা হলে তা ভুল। রাজাকারি মন হলে কীভাবে ইতিহাস লেখা হতে পারে তা তিনি দেখিয়েছিলেন মাত্র !

কিন্তু কেন ? একপাতা পড়েই সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি যুক্ত ছিলেন শান্তি কমিটি বা পিস কমিটির সঙ্গে।

পিস কমিটিতে যোগ দেয়ার কারণ কী বিশেষ করে "পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব্বোচ্চ" কমিটিতে ? কারণ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার পরিজনদের "পাক বাহিনীর অত্যাচার ও জুলুম" থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ পর্যায়ে পাকিবাহিনী যে "নরহত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন'– এর কথা উল্লেখ করেছেন। একথা মুক্তি যোদ্ধারা জানতেন, তারা তাকে শুধু রক্ষা করেন নি, তার "অফিস ঘরে মুক্তিযুদ্ধের একটি অস্থায়ী" অফিসও স্থাপন করেছিলেন। এ ধরনের ঘটনার একমাত্র উল্লেখ তার বইতেই পাই।

যারা শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সবার বক্তব্য একই রকম। খুব একটা হেরফের নেই। "পিস কমিটি বা শান্তি সমিতিতেও যে কিছু লুটেরা পার্টি যোগ দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি তা আমি বলব না। এই কমিটির সকল সদস্যই যে ধোয়া তুলসী পাতা ছিল তাও বলা যায় না। কিন্তু পিস কমিটির অধিকাংশই নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করে গেছেন। খুব কম লোকই দেশের ও দশের অমঙ্গল করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে।"

পিস কমিটি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন। পিস কমিটি গঠনের পর্যায়ে "স্থানীয় কয়েকজন রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে কেন্দ্রীয় পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে দেশবাসির উপর যে অত্যাচার অবিচার ও জুলুমের বান ডেকেছে— তা আমার এককালের সহকর্মী ও বর্তমান গভর্ণর ও সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের নিকট জানাবার সুযোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তারা আমাকে পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে এই মহাসংকটের সময় দেশবাসির খেদমত করলেও স্বাধীনতাউত্তর কালে আমার নিজস্ব বিপদ আপদ ও জেল ফাঁসির ঝুকি আছে তাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।"

তারপরও তিনি যোগ দিলেন পিস কমিটিতে কারণ "দেশের সদ্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা দেশকে কোন আত্মরক্ষার পরিকল্পনা না দিয়েই হঠাৎ করে যে যে পথে পেরেছে ভারতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তাই আমরাও নিজের বুদ্ধিমতে যেমন করে হোক মানুষকে বাঁচাবার পরিকল্পনা করেছি। বলা বাহুল্য আমরা স্বদেশে জনগণের মধ্যে থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও জনগণের সেবা করেছি।" অর্থাৎ, ২৫ মার্চের পর যে এতো অত্যাচার হলো, গণহত্যা হলো তার জন্য আওয়ামী লীগও অনেকাংশে দায়ী।

আফসারউদ্দিন লিখেছেন "আমার হিজলা থানার ও.সি'কে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী থানা লুঠ করে অস্ত্রপাতি নিয়ে যায়— তবুও পাক বাহিনী আমার চেষ্টার ফলে হিজলা থানাতে গিয়ে জনগণকে কোন রূপ অত্যাচার অবিচার বা অপরাশেন করতে পারেনি। লুটপাটতো দূরের কথা নিজের অতি কষ্টার্জিত সঞ্চয় আটকে পড়া মুক্তিযোদ্ধা ও বিপদগ্রস্থ জনগণকে সাহায্য করেছি। এইভাবে সুকৌশলে পিস কমিটির মধ্যে থেকে আমি জনগণের উপকার করেছি। যা পিস কমিটির বাহিরে থেকে করা সম্ভব হতো না।" হয়ত ঠিক। কিন্তু, এ কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তো রাজাকার হিসেবেই পরিচিত হয়ে রইলেন।

১১

যাহোক ১৮ ডিসেম্বর ঢাকার এসপি 'সহানুভূতি' দেখিয়ে তাঁকে বন্দি করে জেলখানায় রেখে এলেন। জেলখানা সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু লেখেননি। অন্য রাজাকাররা কিন্তু কারাবাসের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে জানাবার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ সরকার তাদের ওপর কী অত্যাচার করেছিলো।

জেলখানা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন দেড় বছর পর (১৯৭৩)। এবং জেল থেকে বেরিয়ে কী দেখলেন "স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আর একটি সরকার অবস্থান করছে— যার নাম রক্ষী বাহিনী।"

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর গেলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তাঁকে "বিশাল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আলিঙ্গন করলেন।" আফসারউদ্দিন রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার বর্ণনা করে দেশত্যাগ করবেন কি না জানালেন। বঙ্গবন্ধু বললেন থাকতে। এরপর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলি হয়ত সত্য। কিন্তু, তাঁর বর্ণনা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আবার বলেন, ভারতীয় কারসাজিতে সবকিছু চলছিলো। এমনকী "ভারত প্রত্যাগত আমাদের সরকার ও সরকারি কর্মচারিদের আচার আচরণ ও ব্যবহার দেখে ভারত সন্তুষ্টির জন্য প্রায় সকল স্তরের অধিকাংশ মানুষও ভারতীয় হিন্দুর আচার আচরণ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে গেল।" এমনকী "কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ছিল।" আর ২৫ বছর চুক্তি ? "বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণ ২৫ শালা দাসত্ব চুক্তি নামে অভিহিত করেন।"

সত্যিই রাজাকারের মন বদলানো মুশকিল। সে মন বদলায় না।

১২

এক অজ্ঞাতনামা যুবকের স্মৃতিচিত্র 'বাংলাদেশ সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা'। এই যুবকটি শেখ মুজিবের কথায় বিশ্বাস করে আরো হাজারো দেশবাসীর মতো ১৯৭১ সালে পালিয়েছিলো ভারতে। অন্যান্যদের মতো সেই যুবকও বিশ্বাস করেছিলো যে, ইয়াহিয়ার দমননীতির বিরুদ্ধে আওযামী লীগের বিদ্রোহই হচ্ছে যথার্থ উত্তর। "মুজিবের চেলাদের" অন্তিম লক্ষ্য সে বোঝেনি। ১৯৭১ সালে বিজয়ের পর বিষয়টি অনুধাবন করে। যুবকটির বিবরণের বেশির ভাগ জুড়ে আছে সেই রূঢ় জাগরণের কাহিনী বা বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন চিন্তা।

এ কারণে যুবকের স্মৃতিচিত্রণটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে নাম দেয়া হয় 'সেকেন্ড থট অন বাংলাদেশ' যার বাংলা অনুবাদ করেছি, 'বাংলাদেশ সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা'। ১১৭ পৃষ্ঠার বইটি ১৯৭৯ সালে লন্ডন এবং ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বিবরণটির পাণ্ডুলিপি মতিউর রহমান নামে এক গবেষকের হাতে আসে। মতিউরই সম্পাদনা করে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এখানে তাঁর পরিচয়টা দেয়া দরকার। তিনি পড়াশোনা করেছেন ঢাকা এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর পিএইচ ডি থিসিস 'ফ্রম কনসালটেশন টু কনফ্রনটেশন : এ স্টাডি অফ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স' প্রকাশিত হয়েছিলো লন্ডন থেকে এবং বেশ প্রশংসিতও হয়েছিলো। মতিউর রহমান দেশে ফেরেননি, লন্ডন থেকে যান। ১৯৭১ সালের পর সেখানে 'রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন' নামে একটি কেন্দ্র করেছেন। এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাকিস্তানি আদর্শ তুলে ধরে বাঙালি ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার।

এই বইয়ের শুরুতেই বই সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তার ভাষা প্রয়োগ দেখলেই অনেকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাক্যগুলি এরকম—

১. "duped by Mujibs rhetoric
২. Persuaded to believe
৩. Awami League Rebellion
৪. Mujibs cohort
৫. Rude awakening.

এইসব বাক্যের গঠন-ই বলে দেয় লেখকের মূল দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং তিনি কী বলতে চান। এখানে অনুমান করে নিতে, অনুমান কেন, বলতে দ্বিধা নেই যে, অনামা যুবকের বিবরণটি আসলে সম্পাদকেরই রচিত। অন্যকথায়, পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণার একটি কাল্পনিক বিবরণ।

বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে, সহযোগিতার নামে ঢাকা ভারতের অধীনতা স্বীকার করে নিচ্ছে। ফলে, এতো কষ্টে জেতা স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অনেক নেতা আছেন যারা অখণ্ড ভারত বা ভারতমাতার চিন্তা করেন।

এই আশ্চর্যজনক মন্তব্যটি করেছেন ভূমিকা লেখক রাশব্রুক উইলিয়ামস। নিবাস, বৃটেন। পাকিস্তান পূর্বাংশকে শোষণ করছে, লিখেছেন তিনি, আওয়ামী লীগের এই যে যুদ্ধ-হুংকার তাঁর বিশ্বাস হয়নি। ১৯১৮ সালে তিনি প্রথম পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করেন। পূর্ববঙ্গের নিসর্গের প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি। এখানকার সংস্কৃতি, সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু অঞ্চলটি ছিল অসুখী। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে। অর্থনীতির কেন্দ্র ছিল

কলকাতা, ঢাকা নয়। ঢাকার পাট চলে যাচ্ছে কলকাতায়। পূর্ববঙ্গকে বলা যেতে পারে গ্রামীণ বস্তি।

পাকিস্তান হওয়ার পর অঞ্চলটির বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান যথেষ্ট যত্ন নিয়েছে বাংলাদেশের। এই ডায়েরি পড়ে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন।

এখানে সম্পাদক একটি চমৎকার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। অজ্ঞাত-নামা যুবকটির বিবরণ যে সত্যি তা তো প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং বিবরণে কিছু অস্পষ্ট সত্য রাখা হয়েছে। তারপর ফরোয়ার্ড আর 'প্রলোগে' সম্পাদক ও ভূমিকা-লেখক সেগুলকে খণ্ডন করেছেন। এতে বইয়ের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে না অন্যদিকে তাদের বক্তব্যও থাকবে।

রাশব্রুক লিখেছেন, তাঁর মনে হয়েছে লেখক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন কিছু সমালোচনা করেছেন যা সাধারণত আওয়ামী লীগাররা করে থাকে। যেমন বলা হয়, ১৯৭০ সালের টর্নেডোতে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেনি। রাশব্রুক নিজে পাকি সেনাবাহিনীর অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং জেনেছেন তারা প্রাণ তুচ্ছ করে রিলিফ বিতরণ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হেলিকপ্টার আসতে চাছিলো কিন্তু বাধা দিচ্ছিলো ভারত। লাহোরের মানুষ চাঁদা তুলেছে বাঙালিদের জন্যে।

রাশব্রুক লিখেছেন, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে এ ধরনের "Common accusations"-ও লেখক করেছেন। কিন্তু, সেনাবাহিনী ব্যারাকে থাকার সময় আওয়ামী লীগ যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে তার বিবরণ তেমন নেই। রাশব্রুক দেশবিদেশী অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা জানিয়েছেন, পাকিস্তানিরা নিরপেক্ষ এবং তাদের অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছে পাকিস্তানিরা। তাঁর ভাষায়— "Which terminated a veritable reign of terror directed against innocent people..."

কে এই রাশব্রুক উইলিয়ামস? তিনি লন্ডনে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে এসে সামরিক শাসনের প্রশংসা করে গেছেন। ১৯৭১ সালে তিনিই আবার বলেছিলেন, মার্চে বাঙালিরা হাজার হাজার বিহারী ও অবরুদ্ধ পাকি সৈন্যদের হত্যা করেছে, বিহারী তরুণী ও পাকি অফিসারদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করেছে।

বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন সম্পাদক মতিউর রহমান। বইটি সম্পর্কে প্রকাশক ও সম্পাদকের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। অজানা যুবক বা লেখকের জবানীতে মতিউর যা বলতে চেয়েছেন, তা হলো, সে বাংলাদেশে নিজের ধর্ম পালন করতে পারছে না এবং পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ হওয়ার ফলে

এর ইসলামি সত্তা বিনষ্ট হয়েছে। বাংলার মুসলমান দাস হিসেবে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে ভারতের কাছে। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অখণ্ড বাংলার পথে এগুচ্ছে যা অখণ্ড ভারতের অংশ। এই অখণ্ড ভারতের উত্তর কী ? কী আবার, অখণ্ড পাকিস্তান। পুরো বইয়ের মূল বা নির্যাস এইটিই। এবং এজন্যই ১৬৭ পৃষ্ঠার এই আয়োজন। তবে মূল ভাষা ইংরেজিতে সম্পাদকের বক্তব্যের খানিকটা উদ্ধৃতি দেয়া বাঞ্ছনীয় যাতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়—

and alarmed to find that in trading East Pakistan for Bangladesh. he has sold his Islamic birth right for a men of Hindu pottage. The bizarre mixture of secularism and Brahminical mumbo jumbo favoured by the new rulers...he realises that by seceding from Pakistan, the Muslims of Bengal have virtually sold themselves into Indian slavery."

১৩

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'উই ক্রস দি বর্ডার'। এ অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত। এখানে বর্ণিত হয়েছে, পটভূমিকায় লেখক দেশত্যাগ করলেন। সাধারণ বাঙালি তখন যা ভেবেছে সে বর্ণনাই আছে এ অধ্যায়ে। চাতুরীটা হলো, এ বিবরণ পড়ে মনে হবে, আরে এ তো আমাদেরই লোক। রাজাকার হলে তো এইসব বিবরণ সে লিখতো না। যেমন— "If East Pakistan rose in revolt against Yahya Khan's authority. something must have been basically wrong with the exercise of that authority. Prudence dictates that, instead of trying to "suppress the whole of East Pakistan", he should have made attempts to correct the "worong" in his authority. But then prudence was never the strong point of General Yahya Khan.

"The Pakistan Army – the best in the subcontinent, appeared to have been injected with hatred for Bengalees in general."

তবে, এক্ষেত্রেও একটু কিন্তু আছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখবেন কিছু শব্দ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে আছে। অর্থাৎ কথাগুলি তার নয়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ করবেন পাকি সেনাবাহিনীকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শত চেষ্টা করলেও রাজাকারদের পক্ষে পাকি ভাব লুকিয়ে রাখা মুশকিল।

তা হলেও বলবো, প্রথম অধ্যায়ে এটি বেশ সফলভাবেই করা হয়েছে। আর বিষয়গুলি তো সত্য। বেশি বিকৃত করলে পুরো বইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা

নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। যাক যে চতুরতার কথা বলছিলাম। মনে হবে, লোকটি তো আমাদেরই মতো সাধারণ একজন বাঙালি। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে যেসব হলাহল উদ্গীরণ (যে কারণে বইটি লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে) তখন তা মনে হবে বিশ্বাসযোগ্য। বিদেশীদের কাছে তা আরো বিশ্বসযোগ্য মনে হবে আর বইটি তো বিদেশী পাঠকদের জন্যই লেখা।

এ অধ্যায়ে সাধারণ নির্বাচনের জন্য ইয়াহিয়ার ঘোষণা, নভেম্বরের সাইক্লোন, নির্বাচন সবকিছুরই উল্লেখ আছে। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যখন প্রতিআক্রমণ শুরু করলো পাকিস্তান বাহিনী "তখন আমরা বাধ্য হলাম মাতৃভূমি ত্যাগ করে প্রতিবেশী ভারতে যেতে, যে ছিল আমাদের পুরনো 'শত্রু'। ভারত আমাদের 'টু রেডিলি' আশ্রয় দিলো :" এখানেও স্বাভাবিক বর্ণনার সাথে লক্ষ্যনীয় 'টু রেডিলি' শব্দটি। অর্থাৎ পুরো বিষয়টি পরিকল্পিত। তবে, ঘটনার জন্য লেখক পাকি জান্তার ওপর খানিকটা নাখোশ। তাঁর মন্তব্য— "The military "brains" in Rawalpindi with absolutely no stock of political foresight or sense of history could little visualise that with India all around "East Pakistan", any civil-war-type situation would be fatally disadvantageous to Pakistan herself."

এখানে যাবতীয় বিপত্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ইয়াহিয়া খাঁকে। আর কাউকে নয়, ভুট্টোকে তো নয়ই।

আরো উল্লেখ্য এতো স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্যেও ৭ মার্চ এবং ২৫ মার্চ-এর কোনো উল্লেখ নেই। ২৫ মার্চ ছাড়া যে তখুনিই স্বাধীনতার উল্লেখ হতো না এ বিষয়টি মনে না করিয়ে দেয়ার জন্য ২৫ মার্চই বাদ দেয়া হয়েছে। রাজাকাররা সাধারণত পঁচিশে মার্চ এড়িয়ে যেতে চায় কারণ তা না হলে তাদের প্রভুদের গণহত্যার কথা যে চলে আসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'দি স্ট্রাগল' বা 'সংগ্রাম'। "আমরা এখন ভারতে"— অধ্যায়ের শুরুটা এভাবে। এবং সবসময় আমির বদলে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা।

লেখকের মতে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে। এবং হিন্দু ও ইসলাম— এ দু'টি ধর্মের ভিত্তিতে যে যার দেশে চলে গেছে। কিন্তু, ১৯৭১ সালে যখন দেশত্যাগের প্রশ্ন এলো তখন ভারতে শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমানরাও গেলো। তবে, ভারতীয়রা তাদের 'refugee' না বলে 'evacuee বলেছে। এটি লেখকের কাছে আপত্তিকর ঠেকেছে, কারণ, অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশিনারি অনুযায়ী (১৯৬৬) যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলো তাদের 'ইভাক্যুয়ি' না বলে 'রিফ্যুজি' বলা উচিত ছিল। যে স্থানে বোমা বর্ষিত হতে

পারে সে স্থান থেকে কাউকে সরিয়ে দেয়া হলে সে হবে ইভাক্যুয়ি। আর ধর্মীয় নিপীড়ন বা রাজনৈতিক ঝামেলার জন্য কেউ বিদেশে আশ্রয় নিলে সে হবে 'রিফ্যুজি।' কিন্তু তার পরের লাইনটি লক্ষণীয় "We definitely sought refuge in a foreign country because of "political troubles"

ধর্মীয় নিপীড়নটা গেল কই ? কারণ, পাকিরা ইসলাম রক্ষার নামে মুসলমানদের মেরেছে। একটি লোক হিন্দু না মুসলিম তা পরীক্ষা করেছে। হিন্দু হলে প্রায় ক্ষেত্রে হত্যা করেছে। গ্রাম-কে গ্রাম পুড়িয়েছে কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম টার্গেট হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। রিফ্যুজির আভিধানিক অর্থ দেয়ার পরও, ধর্মীয় নিপীড়নের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কারণ তা হলে বইয়ের পুরো কনসেপ্টটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। বাঙালিদের 'জয় বাংলা' নামে অভিহিত করা হয়েছিলো। বাংলাদেশের কাউকে দেখলে বলা হতো জয়বাংলার লোক। "ভারতে আমাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না।"

এর পরই লক্ষ করি সূক্ষ্মভাবে সুর বদল হচ্ছে লেখকের। জানাচ্ছেন তিনি, হিন্দুরা সেখানে দ্রুত নিজেদের 'অ্যাডজাস্ট' করতে পারলো। কারণ, তাদের আত্মীয়স্বজনরা আগে থেকেই আছে সেখানে। এবং "They were received by their co-religionists with the warmth of a heart distressed at their suffering at the hands of the followers of Islam."

অন্যদিকে, বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য অবস্থাটা ছিল অস্বস্তিকর। ভারতীয় মুসলমানদের ব্যবহার ছিল শীতল, কারণ বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নয়মাসই এই অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করেছে। কারণ, এতোদিন বলা হয়েছে হিন্দুরা নিপীড়ক। এখন দেখা যাচ্ছে উল্টোটা। "আমাদের মধ্যে রাতারাতি অনেকে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূর্তিপূজার ভক্ত হয়ে গেলেন। এমনভাবে তারা ভোল পাল্টালেন যে অনেক বুদ্ধিমান হিন্দুও ধোঁকা খেলেন। এবং তারা এদের বিশ্বাস করতেন Hinduised Muslims হিসেবে।"

তাঁর মতে, বাংলাদেশের হিন্দুদের একটা আলাদা সুবিধা ছিল। তারা ইচ্ছে করলে ভারতে থেকে যেতে পারতো বাংলায় না ফিরে। এ বাক্যটি লক্ষণীয়। এতে লেখক বোঝাতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশকে হিন্দুরা প্রকৃত মাতৃভূমি হিসেবে মনে করে না। তারপর লিখছেন, ভারত আগে এককোটি হিন্দুকে 'এবজর্ভ' করেছে। আরও এককোটিকে 'এবজর্ভ' করা তার কাছে কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, এই এককোটি হবে শেষ বাস্তুহারা। কিন্তু, ঝামেলা মুসলমানদের নিয়ে। কারণ, তাদের সাময়িক আশ্রয় দেয়া যায়, কিন্তু তাদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সুতরাং মুসলমানদের একমাত্র উপায় বাংলাদেশে ফিরে আসা। এ কারণেই, লেখকের মতে, মুক্তিবাহিনীতে হিন্দুর সংখ্যা কম।

এ মন্তব্যের মাজেজা হলো, যুদ্ধটা সব বাঙালির নয়। যুদ্ধটা প্রধানত ঘাড়ে চেপেছে মুসলমানদের। হিন্দুরা দায়ে পড়ে বাংলাদেশে ছিল।

এরপর বর্ণিত হয়েছে যুদ্ধের অবস্থা। অস্ত্র ও রসদের অভাবে মুক্তিবাহিনীকে হটে যেতে হচ্ছিলো, কারণ, তারা বিশ্বের 'শ্রেষ্ঠ' বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। এখানে "শ্রেষ্ঠ" শব্দটি লক্ষণীয়।

অন্যদিকে, লেখকের ভাষায়, ভারতের সংবাদপত্রে ও বেতারে দায়িত্বহীন রিপোর্ট "আমাদেরকে false sense of complacency"-তে রেখেছিলো। যেমন- 'হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড, ১৭ এপ্রিল লিখলো, ঢাকার পতন আসন্ন। ইয়াহিয়া খান সেন্টোর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। "সত্য হলো, ঢাকা নয়, পুরো পূর্ব পাকিস্তানেরই পতন হলো আমাদের কাছে নয়, পাকিস্তানের হাতে।" এভাবে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতীয় কাগজগুলি যুদ্ধ বা পাকিস্তান সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করেছে। কেন ? আন্দাজ করতে পারেন ? তা হলে, তার পরের অনুচ্ছেদে এ লাইনটি লক্ষ করুন—

"Highly exaggerated stories of atrocities by the Pakistan Army were circulated in a calculated manner."

এরই সূত্র ধরে তিনি কিছু কাহিনীর উল্লেখ করতে চেয়েছেন। ভারতীয় প্রচারে বলা হয়েছিলো যশোরের ডি.সি. আবুল ফজল চৌধুরীকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু, দেখা গেল তিনি জীবিত। ঠাকুরগাঁওয়ের এসডিও তসলিমউদ্দিন শোনা গেলো নিহত। কিন্তু তসলিমউদ্দিন তো বেঁচে ছিলেনই এবং পরে যোগসাজশের কারণে বাংলাদেশ আমলে জেল খেটেছেন।

লেখক এসব কাহিনী তুলে যা বলতে চেয়েছেন, তা হলো, ঘটনা যা ঘটেনি সেগুলিও প্রচার করে হানাদার ও রাজাকারদের কলঙ্কিত করা হয়েছে যা ঠিক নয়। তিনি উল্লেখ করছেন, ভারতীয় এসব প্রচার কার্যকর ছিল। এবং ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি যে আলাদা হলো তাতে ভারতীয় জওয়ান থেকে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের কৃতিত্ব বেশি। তাঁর ভাষায়— "But the story of "killings and "barbarities" told by the Indian Press and radio was compossed with eighty percent falsehood as the essential ingredient. It is no exaggeration to say that Indian propaganda media did much, much more than the Indian Army, in effecting the separation of Bangladesh from Rawalpindi, credit goes more to the Indian news writers than to the "brave jawans of Bengal."

এরপর আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রথম দিকে সমন্বয় ছিল না। সরকার গঠিত হবার পর সেসব ত্রুটি দূর হয়। তাঁর মতে, "স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হলো।" ইংরেজি যে শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা হলো "secession"; independence শব্দটির সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য আছে। অজানা লেখকের এর পরের অনুচ্ছেদটি গুরুত্বপূর্ণ—

"আমাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা অন্যরকম চিন্তাভাবনা করতেন। আমরাতো শুধু পাকিস্তানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম না, সংসদেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম। secession-এর পথে না যেয়ে তারা প্রবাসী পাকিস্তান সরকার গঠন করতে পারতো। এটি একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সরকার হতো। কারণ, এটি গঠিত হতো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দ্বারা। ফলে, সব দেশের নৈতিক সমর্থন পেতো তা। স্বীকৃতিও পাওয়া যেতো। জেনারেল ইয়াহিয়া পড়তো বেকায়দায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি অংশ তখন বিদ্রোহ করতো। জেনারেল ইয়াহিয়া বাধ্য হতেন ক্ষমতা হস্তান্তরে। বিরুদ্ধ পদ্ধতি ছিল, ইয়াহিয়া খানকে বরখাস্ত করে আরেকজন সেনাধ্যক্ষ ঘোষণা করা। তা হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতো এবং গণতন্ত্র ফিরে আসতো।" খন্দকার মোশতাকের চিন্তাধারা আর কী ! লেখকের 'আমরা' অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মোশতাক অংশ।

রাজাকারদের বিকল্প কেন কার্যকর হলো না ? কারণ, ভারতীয়রা তা হতে দিলো না। তাদের নিজস্ব খেলা ছিল। লেখকের ভাষায় "আমরা বিচ্ছিন্ন হলেও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করবো। আমাদের আশ্রয়দাতাদের সঙ্গে ঝগড়া করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করলাম।"

এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা তেমন ছিল না। ভারতীয়দের চাপে পড়ে তা করতে হয়েছে। এটি স্বোপার্জিত নয়। এই দু'টি অনুচ্ছেদই লেখকের মনের গড়ন স্পষ্ট করে তোলে। রাজাকারের সমস্ত চিন্তা-চেতনা সব রাজাকারি লাইনে।

এরপর বর্ণনা দেয়া হয়েছে মুক্তিফৌজ সম্পর্কে। কোন কোন সেক্টরে তাদের ভাগ করা হয়েছিলো এবং কী ভাবে কাজ চলছিলো। তাঁর মতে, যেহেতু পাকিস্তানের মতো প্রথম শ্রেণীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ সম্ভব ছিল না সেহেতু বিকল্প পন্থা হিসেবে গেরিলা যুদ্ধই ছিল উপযুক্ত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল—

১. দীর্ঘ সময়

২. একটি নিরাপদ ঘাঁটি।

তারপর, এ দু'টি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে যা অপোতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু, লেখকের কাছে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক কারণ এর মাধ্যমেই তাঁর বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কী সেই বক্তব্য ?

তাঁর মতে, নিরাপদ ঘাঁটি তৈরি সম্ভব ছিল না। প্রস্তুতিও ছিল না যে জন্য ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। কিন্তু, এ বিষয়ে অন্য মতামতও আছে, জানিয়েছেন লেখক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যারা বিশ্বাস করে তারা অন্য কথা বলে। ভারত, অনেক আগেই বাংলাদেশকে নিরাপদ ঘাঁটি ও অস্ত্রশস্ত্র দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। এবং অনেক ভারতীয় গর্বের সঙ্গে [এখন অর্থাৎ যখন তিনি এটি লিখছেন] বলে থাকেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তারাই ঘটিয়েছিলো এবং জাতীয়তাবাদের বাতাবরণে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে তারাই উৎসাহিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'স্বাধীনতা'র মতো সুন্দর শব্দটি চালু করেছিলেন তারাই। ইত্যাদি। বস্তুত এ ক'টি বাক্য লেখার জন্যই এতোবড় সত্যমিথ্যা মিশ্রিত পটভূমির সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর যোগ করেছেন নিজের মন্তব্য— হিন্দুরা মুসলমানদের আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়— অন্যদলের হিন্দু প্রার্থীদের বাদ দিয়ে।

আবেগের চোটে মতিউর রহমান ওরফে অজানা লেখক ভুলে গেছেন যে, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং আওয়ামী লীগে শুধু মুসলমান নয় সব সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। এবং এর নেতারা সবাই মুসলমান ছিলেন না।

এ প্রসঙ্গে তিনি বীরেন সরকার নামে একজনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যিনি ছিলেন রাজশাহীর প্রখ্যাত হিন্দু রাজনৈতিক নেতা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ন্যাপের হয়ে হিন্দু-অধ্যুষিত একটি অঞ্চল থেকে প্রার্থী হিসেবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ন্যাপের নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন, হিন্দু ভোটের জোরে তিনি জিতবেন। কারণ, অন্য প্রার্থীরা ছিলেন মুসলমান। বীরেন সরকার কিন্তু তাঁর এলাকা ঘুরে এসে জানালেন যে, পরিস্থিতি ভিন্ন। হিন্দু নেতারা গোপনে মিলিত হয়ে বীরেন সরকারকে তিরস্কার করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী না হওয়ায়। কারণ, ভারত থেকে হিন্দুদের কাছে নির্দেশ এসেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে ভোট দিতে। কিন্তু কেন ? প্রশ্ন করেছিলেন সরকার। কারণ, পাকিস্তান ভাঙ্গতে। কিন্তু, তা হলে তো পাকিস্তানি বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে, জানিয়েছিলেন সরকার। তাতে কী ? তাদের উত্তর। এজন্য সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। বীরেন সরকারের কাহিনী, তাঁর মতে, "authoritative account." বা বিশ্বাসযোগ্য। বীরেন সরকার যে নির্বাচিত হননি তাই সেই কাহিনীর সত্যতা প্রকাশ করে।

মতিউর এখানে ভুল করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের এটিই ছিল আদর্শ। ধর্মের উর্ধ্বে উঠে বাঙালিত্ব গ্রহণ করা যা রাজাকাররা মানতে চায়নি। এটিই ছিল মূল দ্বন্দ্ব। আদর্শিক যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

লেখকের মতে, ১৯৭০ সালে নির্বাচনের আগে আকাশবাণী থেকে বলা হতো, আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়া উচিত, কারণ, তারা প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে। এবং আহ্বান জানান হতো, নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য। সে সময়টায় আপনারা তো অনেকেই ছিলেন বাংলাদেশে। শুনেছেন এরকম কোনো কথা ?

আবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রসঙ্গ। লেখকের মতে, এ ষড়যন্ত্র যে সত্য তার প্রমাণ শহীদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রীর চিঠি। এই চিঠি প্রায় সব রাজাকারই উল্লেখ করেছেন তাদের গ্রন্থে এটা প্রমাণের জন্য যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের যোগসাজশ ছিল। এটা যে সত্য তার প্রমাণ শেখ মুজিবুর রহমানও লিখেছেন মতিউর। খোন্দাকর ইলিয়াস তাঁর 'মুজিববাদ' গ্রন্থে ৫৭৮ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ করেছেন, "বিচলিত বঙ্গবন্ধু তাঁর একখানি হাত আমার কাঁধের উপর রেখে চোখ মুছতে মুছতে বলেন এক মুজিবকে ওরা হত্যা করলে দেশে লক্ষ মুজিবের পয়দা হবে। আর তুমিতো জানই আমরা একা নই। কাজেই দেরি করো না, এখনই বেরিয়ে পড়ো, যা যা বললাম সেই ভাবেই কাজ করো।" অজানা লেখক এখানে "আমরা একা নই" এই লাইনের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ওই এক লাইনের অন্য অর্থও হতে পারে। কিন্তু, রাজাকারদের যেটি পছন্দ তার ওপরই তারা গুরুত্ব দেবে। লেখক আরো উল্লেখ করেছেন, ভারত যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে তা নির্ভেজাল মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁর ভাষায়—

"It was not all that 'humanitarian.' The milk of humanitarian emotion was sufficiently adulterated with the water of 'self interest'. so much so that in the final analysis, only water remained."

তারপর শুরু হলো যুদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর ওপর দিয়েই ঝাপটাটা গেলো। ফ্রন্টে আগে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো মুক্তিবাহিনীকে। কিন্তু ভারতীয়রা কখনও যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি মুক্তিবাহিনীকে। কখনও তারা বলতো না 'যৌথ বাহিনী'। বলতো, 'ভারতীয় জওয়ানরা'। তাঁর ভাষায়—

"It was given out that the "brave Jawns of Bharat" were out on a mission of "conquest" although we have always been insisting in a mission of liberation."

এ বিষয়ে বিস্তারিত তিনি লিখেছেন। তারপর উল্লেখ করেছেন, ২৫ মার্চ থেকে বলা হচ্ছে, মৃত বাঙালির সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। কিন্তু, 'দি গার্ডিয়ান'-এর সূত্রে পরে জানা যায়, তদন্ত করে দেখা গেছে মৃতের সংখ্যা মাত্র ২০০০। "The claim of three millions Bengalis killed, made by Mujib and his Indian allies is a classical example of a colossal lie..."

পাকিদের হামুদুর রহমান কমিশনও একই মন্তব্য করেছে। এ নিয়ে নতুন কিছু বলা অবান্তর। তা ছাড়া, তাঁর মতে ভারত চায়নি, কখনও পাশে আরেকটি 'পাকিস্তান' গড়ে উঠুক। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য গৌরব দিতে ভারত নারাজ।

সব রাজাকার যা বলে, মতিউর রহমান ওরফে অজানা লেখকও তাই বলেছেন— "Hindu India has never ceased to nurture a deep seated hatred towards all that is Muslim and Islamic."

১৪

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম ইতিহাসের বিচার। প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসের আলোকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচার করা হয়েছে। তিনি কী বলতে চান তা অধ্যায়ের প্রথম বাক্যেই উল্লেখ করেছেন— ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান ও হিন্দুগরিষ্ঠ ভারতে বিভক্তি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনীয়তা যে ছিল তা দেখিয়েছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকের পরিপ্রেক্ষিতহীন উদ্ধৃতি দিয়ে।

তাঁর মতে, বৃটিশরা আসার পর থেকে মূলত হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের শুরু। চরম হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে মুসলমানদের "সাম্প্রদায়িকতা" ছিল একধরনের আত্মরক্ষামূলক মনোভাব।

১৯৪৭ সাল থেকে ভারত ঘোষণা দিয়ে আসছে যে সে ধর্মনিরপেক্ষ যার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, যেখানে দেব-দেবীর এত ছড়াছড়ি সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা হবে কী ? ভারতীয় জাতীয় পতাকাতেই আছে অশোক চক্র। কারণ, অশোক হিন্দু রাজা। পরে, তিনি বৌদ্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর হিন্দুত্বই ভারতীয়রা জেনেছে বেশি।

১৯৪৭ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে যা পালিত হয়ে আসছে ১৯৭১ সালের পর তাকেই 'ফরমাল শেপ' দেয়া হয়েছে। দেশের একটি স্তম্ভ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আইয়ুব খানের সময় হিন্দুরা সব গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছে। পাকিস্তান আমলে দুর্গাপূজায় ছিল দুইদিন সরকারি ও দুইদিন 'অপশনাল' ছুটি। ভারতে ঈদের ছুটি মাত্র একদিন।

মূল কথা হলো— ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতে একটি ভাঁওতা। পাকিস্তান নামেই ছিল ধর্মরাষ্ট্র মাত্র।

তারপর কীভাবে ভারতে মুসলমান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ নষ্ট হচ্ছে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাজমহল যে হিন্দু রাজা তৈরি করেছেন— এ নিয়ে ভারতে কারা কী লিখেছে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটিই হচ্ছে মুসলমানদের হেনস্থা করা। তাঁর ভাষায়—

"The present day Indian history written by the so-called nationalists abounds in such myths. Authors of these "studies" can stoop to any level when the task is of villifying and degrading Islam."

লেখক অবশ্য উল্লেখ করেন নি, কেন আমাদের মাপকাঠি হবে ভারত ? কেন সব বিষয়ে আমাদের তুলনা হবে ভারত ? এটি কি একধরনের হীনম্মন্যতা নয় ? পুরনো ইতিহাস বাদ দিলেও ১৯৪৭-এর পর থেকে উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হতে পারেনি। এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গঠনের জন্য উপমহাদেশের প্রতিটি অংশেই চেষ্টা চলেছে এবং চলছে। কিন্তু, তা সফল হয়নি এইসব মতিউর রহমানদের জন্য। তাজমহল শাহজাহানের তৈরি নয় এরকম উক্তি করতে পারেন মতিউর রহমানের মতো লোকেরাই। সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর যে আইয়ুব খানের তিনি প্রশংসা করেছেন সে আইয়ুব খানের আমলেই কি হিন্দুদের শত্রু ঘোষণা করে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' করা হয়নি ? ভারতে কি এ ধরনের কোনো আইন হয়েছে ? ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব দেখানোর জন্য সবসময় একজন 'হিন্দু' কে মন্ত্রী করা হয়েছে এবং গুরুত্বহীন মন্ত্রণালয় দেয়া হয়েছে। কিংবা, সেনাবাহিনীর কোনো প্রধান পদে বা পররাষ্ট্র, অর্থ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে কি কোনো সচিব দেয়া হয়েছে ? হয়নি, ভারতে তা হয়েছে। কিন্তু, এসব তুলনামূলক আলোচনা কোনো বিষয় নয়। রাজাকারদের একমাত্র 'অবশেসন' ভারত।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আসল হুমকি'।

এই হুমকিটি কী ? পূর্ববর্তী অধ্যায়ের জের টেনে এই অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। আলোচনার মূল বিষয় ভারত।

ভারত ভেতরে বাইরে একেবারে হিন্দুরাষ্ট্র। ইসলাম এবং মুসলিম শব্দটি তাদের দু'চোখের বিষ। হিন্দু ভারতের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে ভেঙে দেয়া। লিখেছেন তিনি, "আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলার মাধ্যমে মুক্তি। দিল্লীর শাসকদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান থেকে পূর্ব-বঙ্গকে আলাদা করা। কিন্তু, এটিই শেষ লক্ষ্য নয়। এটি প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে দিল্লীর অধীনে একটি করদ রাজ্য সৃষ্টি করা অথবা অঞ্চলটিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা। পশ্চিমবঙ্গের নামকরণ ইতোমধ্যে

করা হয়েছে 'বেঙ্গল' এবং অধিবাসীদের 'বাঙালি'। সব ভারতীয় নেতা একই কথা বলবেন। ভারত বিভক্তি মানি না।"

রাজাকাররা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে যা বলে, অজানা লেখক সবশেষে সেটিই বলছেন— "No Pakistan. No Banglaesh, no Mujib! Hindu India has reasons to castigate to condemn Pakistan."

এ পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেউ বলে "No India, No Pakistan."

তখন উত্তর কী হবে ?

অজানা লেখক আরো জানাচ্ছেন, ভারতীয়রা কোরাসে বাংলাদেশের নিন্দা করতে পারে কিন্তু "আমরাও" যদি কোরাসে পাকিস্তানের নিন্দা করি তা হলে তা হবে কৃতঘ্নতা। কেন ? পাকিস্তান না হলে কি হাইকোর্ট হতো ? হতো কি বিচারপতি ও উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী ? অথচ, আজকের "পাকিস্তানকে তিনিই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন"। উপমহাদেশের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে ? আমাদের মতো সাধারণ মানুষের এসব ভুল-ত্রুটি করা উচিত নয়।

"Let us bow down our heads in respectful memory of Pakistan for all that she gave us during her twenty-four years."

এরপর মতিউর ওরফে অজানা লেখক ভারতীয় কিছু অজানা সাংবাদিক লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, ভারতীয় হিন্দুরা কীভাবে বাংলাদেশকে গ্রাস করতে চায়। "আমার স্বাধীনতার হুমকি হচ্ছে ভারতের এইসব elements." তাদের উদ্দেশ্য বিবিধ :

১. অর্থনৈতিকভাবে গ্রাস করা

২. সাংস্কৃতিকভাবে গ্রাস করা

৩. অন্তিমে রাজনৈতিকভাবে গ্রাস করা।

লেখকের মতে, অর্থনৈতিকভাবে গ্রাস ভারত ১৯৭২ সালেই করে নিয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে সবসময় দিল্লীর তাঁবে রাখবে। বাংলাদেশ কোনো স্বাধীন ব্যবস্থা নিলেই বিপর্যয় হবে। শিল্পোন্নত বাংলাদেশ ভারত কখনও চাইবে না।

কালোবাজারি বাড়বে। মুদ্রামান হ্রাস পাবে। সাংস্কৃতিকভাবে পদানত হবে। এই পদানতকরণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশকে আর কুক্ষিগত করতে হবে না। এবং "with the establishment of complete economic and cultural hegemony, factions and parties would emerge on the soil of Bangladesh demanding Delhis intervention and control."

আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, তাঁর ভাষায়– "be it not be said by the future generation that we simply replaced Pakistani Muslim

exploiters by their Indian Hindu Counterparts at the cost of thousands of valuable life."

বাংলাদেশ শিল্পোন্নত না হোক এটা কে চেয়েছিলো ? ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত শিল্পখাতে কেন্দ্রীয় সরকার এ অঞ্চলে কত বিনিয়োগ করেছিলো ? বাংলাদেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ত প্রতিটি সরকার শিল্পখাতে যে বিনিয়োগ করেছে এবং সুযোগসুবিধা দিয়েছে তা কৃষিখাতে দেয়নি। শিল্পখাতে বিনিয়োগ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ঋণখেলাপি নামে নতুন শ্রেণী। এ শ্রেণীতে হিন্দু কয়জন বা মুসলমান কয়জন ? এবং এরা কি ভারতীয় এজেন্ট ? বাংলাদেশের কালোবাজারিতে কি হিন্দুরাই বেশি জড়িত না তাতে মুসলমানরাও আছে এবং তারা কি ভারতীয় এজেন্ট ? ভারত কি বাংলাদেশের মানুষদের বলেছে তাদের চ্যানেল টিভি দেখার জন্য বা তাদের হিন্দি গান শোনার জন্য ? কিন্তু, এসব যুক্তি তর্ক, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তবতায় কোনো কাজ হবে না। রাজাকারের একটিই চিন্তা, কেন পাকিস্তান থাকলো না। কেন বাঙালিরা পাকিদের বুটজুতা মাথায় তুলে রাখলো না। ঐ বুট মাথায় করে রাখলে ইসলাম টিকতো। পাকিস্তানের তরিককি হতো। বাঙালির কী হতো তাতে কিছু আসে যায় না।

১৫

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম "ইন দি অফিং" বা কী আসছে ? কী হবে ?

পাকিস্তান যারা করেছিলেন তারা বলেছিলেন, পাকিস্তান থাকবে। থাকেনি। মুসলমানরা সাতশো বছর রাজত্বের পর হারিয়ে গেছে। কারণ কী ? দক্ষ সেনাবাহিনীর অভাব। কিন্তু, পাকিস্তানের দক্ষ সেনাবাহিনী থাকতেও তারা পারেনি। কারণ, তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেনি।

বাংলাদেশের জনকরাও বলছেন, বাংলাদেশ থাকবে। কিন্তু, টিকে থাকতে হলে কী করতে হবে ? তাকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তার থাকতে হবে দক্ষ সেনা ও নৌবাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও চালু রাখতে হবে। এরপর 'ইনকিলাবি' ভাষায় বলা হয়েছে, যারা বলে সেনাবাহিনীর পিছে টাকা খরচ করা বাতুলতা তাদের কথায় যদি কান দেয়া হয় তা হলে—

"History will record us as a band of criminals who only separated Bangladesh from Pakistan in order to make a gift of it to the imperialist of Delhi."

এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

এরপর মতিউর এসেছেন মূল অর্থাৎ রাজাকারি বক্তব্যে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সে কি ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ? মোটেই না। বরং, কমনওয়েলথের সদস্য হয়েছে। তেমনি, বাংলাদেশের এখন উচিত হবে, পাকিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা। পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে পাকিস্তান থাকলে আর কোনো চিন্তা নেই। ভারত কিছু করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, ভারতের প্ররোচনায় চীনবিরোধী কোনো নীতিও গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

বিহারিদের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। অহিংস আন্দোলনের নামে বাংলাদেশে বিহারি মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। দিনাজপুরেই হত্যা করা হয়েছে বারোহাজার বিহারিকে। সুতরাং, বিহারিনিধন সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। ইপিআর এর পোশাক পড়ে ভারতীয় এজেন্টরা এসব বিহারিকে হত্যা করেছে। তাঁর ভাষায়— "most gruesome massacures in the history of homicide, that of Bihari Muslim, butchered irrespective of age or sex."

যাহোক, মুলকথা হলো, যা হবার তা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে হবে। বর্ডার সীল করে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রভাষাটাও বদল করতে হবে। ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা হলে মন্দ হয় না।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'দি ক্রাই অব মুসলিম বাংলা' বা মুসলিম বাংলার চিৎকার হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম। এ অধ্যায়ের মূল থিসিস হলো— বাংলাদেশ স্থাপনের অর্থ কি এই যে বাংলাদেশের মুসলমানদের মুক্তির পথ শেষ হয়ে গেলো ? তিনি যা বলতে চাচ্ছেন তা হলো— বাংলাদেশ স্থাপিত হয়েছে দেখে কি মুসলমানত্ব শেষ হয়ে গেলো ? তা যে হয়নি সেটা বোঝাবার জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা।

লেখক জানাচ্ছেন, ১৬ ডিসেম্বর থেকে ভারতের প্রতি যে উচ্ছ্বাসই থাকুক না কেন বাংলাদেশের মানুষের তা উবে গেছে। সব পর্যায়ে এখন ভারত বিরোধী চেতনা প্রবল। এ ঘৃণাকে পুঁজি করছে এখন বিরোধীরা, যেমন, মওলানা ভাসানী, মেজর জলিল, অলি আহাদ প্রমুখ। যে যা-ই করুক না কেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন মনে করছে তারা প্রতারিত। লেখকের ভাষায়, "there is no gainsaying the fact the people of Bangladesh to day feel betrayed and cheated." না, এখানেই শেষ নয়, তারা বুঝতে পারছে আওয়ামী লীগ ও ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতারণা করেছে।

তৎকালীন বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের রাজনীতির কী অবস্থা। তারপর যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হলো, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বাংলাদেশে মুসলমানরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে ভাবতে পারছে না যা তারা পেরেছিলো প্রাক-বাংলাদেশে। এবং এ বিষয়টি সবাইকে অসন্তুষ্ট করে তুলছে বিশেষ করে অশিক্ষিত অংশকে যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলো। তারা বারংবার এখন মুসলিম বাংলার কথা বলছে—

"Its significance consists in the fact that it is a revival in unmistakable form, of the old sentiment of Muslim separatism cutting across economic and cultural differances between classes."

মনে রাখা প্রয়োজন, ঐ বইটি প্রকাশিত হয় লে. জে. জিয়াউর রহমানের আমলে। মুসলিম বাংলাদেশের কনসেপ্ট নিয়ে তিনি বিএনপি গঠন করেছেন। এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'র বদলে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' বলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ কারণেই, লন্ডনে বসে লেখা মতিউর রহমানের মনে হয়েছে বাংলাদেশে মুসলিম বাংলা গঠনের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। বা অন্য কথায় তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাজাকাররা ছাড়া পেয়েছে এবং রাষ্ট্রে ও সমাজে তারা পুনর্বাসিত হচ্ছে। এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার একটি বিষয় ছিল প্রপাগান্ডা বা মগজ ধোলাই। 'সেকেন্ড থট অন বাংলাদেশ' সেই প্রপাগান্ডা যুদ্ধেরই একটি ফল।

১৬

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকতা'। আসলে, পুরো বইটিতেই লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন 'ভারতের বিশ্বাসঘাতকতা' ও 'মুসলমানবিদ্বেষ'। একটি অধ্যায় নয়, বইটির শিরোনামই 'ভারতীয় বিশ্বাস-ঘাতকতা' দেয়া যেতো।

লেখক জানাচ্ছেন, ভারত তো সবসময় বিশ্বাসঘাতকতা করছেই। প্রথমদিকে, অধিক টাকা ছাপিয়ে তারা বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের সব পাট চলে যাচ্ছে ভারতে। ভারতের মিলগুলি চলছে পূর্ণোদ্যমে আর বাংলাদেশের মিলগুলির হচ্ছে ক্ষয়। ভারত বাংলাদেশকে কখনও উঠতে দেবে না। প্রয়োজনে এর পেশাজীবীদের হত্যা করবে কিন্তু

দোষ দেবে আল-বদরদের। পাঠ্যপুস্তক বদল করা হচ্ছে— "the selections and writings have been very carefully made with an eye to intellectual and cultural upgrading of thing Muslim. The balanee of seculiarism is always tilted in favour of Hindu Culture is Bangladesh. গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে যাতে বাংলাদেশের মানুষকে ইসলামি সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। যেমন, শাপলাকে করা হয়েছে জাতীয় ফুল। কিন্তু, শাপলা তো হিন্দু দেবতা ব্রহ্মার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের নাম সেখানকার লোকেরা লেখে বাংলাদেশ। এরপর দীর্ঘ অবান্তর আলোচনা করা হয়েছে খন্দকার ইলিয়াসের 'মুজিববাদ' নিয়ে।

মোটকথা ভারত যদি বাংলাদেশকে নিয়ে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতে চায়, তবে বাংলাদেশকে অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখতে হবে। আর বাংলাদেশের 'স্টেটহুড'কে যৌক্তিকতা প্রদান করলে, ভারতকেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করা উচিত। ভাষাগত এবং জাতিগত দিক থেকে। তাঁর ভাষায়— "In order to prevent a merger with Akhand Bharat Mata— a long cherished dream of Hindu India— there is another alternative before Bangladesh, merger with Pakistan.

এখন কি আপনাদের কাছে স্পষ্ট হলো কেন অজানা লেখক ওরফে মতিউর রহমান এ বইটি রচনা করেছিলেন?

এরই সূত্র ধরে লিখিত হয়েছে উপসংহারটি। তবে, তা অজানা লেখকের নয়। সম্পাদকের। তিনি জানাচ্ছেন, বর্তমান বইটির একটি বড় অংশ ১৯৭২-৭৩ সালে লেখা। তিনি এখন (১৯৭৯) তা 'আপডেট' করছেন। এই বর্ণনায় বাংলাদেশ হওয়াতে, বাংলাদেশের মানুষ ও উপমহাদেশের কী কী ক্ষতি হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলির সারমর্মই উপস্থাপন করেছেন।

১. বাংলাদেশ এখন উদ্দেশ্যহীন স্বরূপ-অন্বেষায় সে ব্যস্ত কারণ তা তার অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। আর এই যে বাংলাদেশ হয়ে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দূষবে পূর্বসুরিদের। আর শেখ মুজিবের সঙ্গে মীরজাফরের তফাতটা কী? উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও সম্পাদকের ভাষায় তা উদ্ধৃত করতে চাই—

১. "Bangladesh to day remains a country without much sense of purpose or identity. There is an effort to erect some kind of post-facto nationalism, but actually on the remains of Mujibs secularism. So the outcome can well be foreseen."

২. "And that in sum is a measure of the achievement of those who succeeded in dismembering Pakistan to the perhaps irreversible loss of

the Muslims of the subcontinent, a legacy for which they shall be cursed by all succeeding generations with the master juggler Mujib cut for ever in the role of Mirjafar. Thus, in the final analysis, Mujibs lasting contribution may be in the field of linguistics his name a synonym for treachery."

পাঠক এবার অনুধাবন করুন, কেন একথা বারবার বলি যে, একবার রাজাকার তো সবসময় রাজাকার।

১৭

হানাদার বাহিনী যখন ঢাকা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং গঠন করা হয়েছে পুতুল মালেক সরকার তখন আখতারউদ্দিন আহমদ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে মালেক সরকারে যোগ দেন। স্বাভাবিক কারণেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মুক্তি পান ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে। জেলে থাকার সময় আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন ইংরেজিতে, যার নাম "ন্যশনালিজম অর ইসলাম ইন্দো পাকিস্তান এপিসোড"। ৩৩৭ পৃষ্ঠার বইটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক থেকে। এর দু'বছর পর ১৯৮৪ সালে বইট আবার প্রকাশিত হয় ভারত থেকে।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর বছরখানেক ঢাকায় ছিলেন আখতারউদ্দিন, তারপর চলে যান সৌদি আরব। সেখানেই থাকতেন। এখন কোথায় আছেন বা বেঁচে আছেন কি না জানি না। সৌদি সরকার তাঁকে খাতিরযত্ন করেছে যেমন করেছে অন্য রাজাকারদের। এটা স্বাভাবিক। যতই মুসলমান মুসলমান করুন, মুসলমান উম্মাহ্‌র কথা বলুন, মনে রাখা দরকার ১৯৭১ সালে সৌদিরা হানাদার পাকিদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলো। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিধনে তাদের কিছুই এসে যায়নি, যেমন যায়নি তার দু'দশক পর কসোভোয় মুসলমান নিধনে। আখতারউদ্দিন লিখেছেন, রাজাকারদের দর্শন সৌদিরা বুঝেছিলো এবং রাজা ফয়সল "showed great understanding of our cause, can never be thanked enough."

২৮ অধ্যায়ে বইটি বিস্তৃত। তবে, অধিকাংশই প্রসঙ্গবহির্ভূত। তার বইয়ের মূল থিসিস বইয়ের নামকরণেই বিধৃত। জাতীয়তাবাদ বা ইসলাম— এ দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। জাতীয়তাবাদী শক্তি সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ, সুতরাং, জাতীয়তাবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এর বিপরীতে

গ্রহণযোগ্য হচ্ছে ইসলাম। এবং এ কারণেই তিনি হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করেছিলেন। বস্তুত, সব রাজাকারেরই ডিফেন্স একটিই— তারা ইসলাম রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ইসলামরক্ষার্থে কেন খুন জখম ধর্ষণ লুটপাট করলেন তা কোথাও উল্লেখ করেননি।

আখতারউদ্দিনের বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'কনসপিরেসি অ্যান্ড ওয়ার' বা 'ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ'। শিরোনামটি লক্ষ করুন। ১৯৭১ সালের ঘটনাটি ছিল ষড়যন্ত্র। কার ষড়যন্ত্র ? কেন, ভারতের ? এবং তারই পরিণাম 'পাক-ভারত' যুদ্ধ। তার বইটি কিন্তু আবার প্রকাশিত হয়েছে ভারত থেকে।

শুরুটা হলো নাটকীয়। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) মালেক মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছে। দুপুর একটায় বোমা পড়লো বঙ্গভবনে। মন্ত্রিসভার ১৩ জন সদস্য এতে অবাক হলেন না। শুধু একজন চিৎকার করে বললেন, "ভারতীয়রা বেসামরিক গভর্নমেন্ট হাউজকেও ছাড়ছে না। কিছুক্ষণ আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও বোমা ফেলা হয়েছে। কয়েকদিন আগে, রাতে তেজগাঁর এতিমখানায়ও বোমা ফেলা হয়েছে। মারা গেছে অনেক শিশু ও শিক্ষক ? এরপর কী ?" এখানে যে-শব্দটির ব্যবাহর লক্ষণীয় তা হলো 'বেসামরিক'। অর্থাৎ ভারতীয়রা যুদ্ধের নর্ম বা রীতি ভাঙছে। কিন্তু পাকিরা ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ভূখণ্ডে যা করেছিলো তা নর্মের মধ্যে পড়ে কিনা সে সম্পর্কে কোন জবাব পাওয়া যাবে না।

ঢাকা ছাড়াও ময়মনসিংহ, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং অন্যান্য জায়গায় সিভিলিয়ানদের ওপর বোমা হামলার খবর আখতারউদ্দিনরা পাচ্ছিলেন অর্থাৎ ভারতীয়রা সিভিলিয়ানদের ওপরই বোমা হামলা করে যাচ্ছিলো। কিন্তু, এই স্থানগুলি কি তখন সিভিলিয়ান কর্তৃত্বে ছিল নাকি সেনা-অধিকৃত ছিল তা আখতারউদ্দিন লেখেননি।

বোমা হামলার পর ক্যাবিনেট নিরাপদ আশ্রয়ে অর্থাৎ ট্রেঞ্চে গেলো। সেখানে দুই মন্ত্রী সুলেমান ও কাশেম ক্যাবিনেটের পদত্যাগের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন কিন্তু আখতারুদ্দিনের মনে হয়েছিলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটা মীমাংসার কথা তার। ভাবছিলেন। তিনি বরাবর শান্তির পক্ষেই ছিলেন কিন্তু (১৪ ডিসেম্বর) এখন তা বাতুলতা আর অসম্মানজনকও বটে, কারণ ভারত যুদ্ধবিরতি নয়, আত্মসমর্পণের কথা বলছিলো এবং তাঁর মনে হয়েছিলো আত্মসমর্পণ থেকে মৃত্যুবরণ করা বরং শ্রেয়।

এ অধ্যায়ে আবার প্রাক-'৭১-এর খানিকটা স্মৃতিচারণও আছে। পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি করে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করেছিলো কিন্তু ব্যাপক কারচুপি

করেছিলো নির্বাচনে। বিচ্ছিন্নতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। ছয়মাস এসব টানাপোড়েনে মানুষজন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো এবং সমস্যা নিরসনের জন্য মালেককে গভর্নর করা হলো। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলেন এবং আখতারউদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানালেন মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য। গভর্নর মালেক বলেছিলেন, "আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এবং প্রেসিডেন্টকে আমি জানিয়েছি রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।"

আখতারউদ্দিন আমন্ত্রণ পাবার পর সব বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণে চারটি বিকল্প পন্থা ছিল—

১. সবদল মিলে সরকার গঠন করলে মানুষের আস্থা ফিরে আসবে এবং যারা সীমান্ত অতিক্রম করছে তারাও আস্থাবান হয়ে উঠবে।

২. ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারত পাকিস্তান ভাঙার যে ষড়যন্ত্র করে আসছে তা সবার সামনে তুলে ধরা যাবে।

৩. কিসিঞ্জার ফারল্যান্ড পাকিস্তান ভেঙে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা মজবুত করতে চাচ্ছে এবং তাতে রুশ-ভারতের সমর্থন আছে।

৪. আওয়ামী লীগের ৬ দফা সমর্থন পাচ্ছে এখন সিআইএ ও কেজিবি'র যারা এই অঞ্চলের মানুষকে ধ্বংস করে দেবে।

প্রথম দুইটি যুক্তি তর্কে না গিয়ে মেনে নিলেও আখতারউদ্দিনের শেষ দু'টি বিশ্লেষণ দেখুন। ভারতবিরোধী 'অবশেসন' কী পর্যায়ে গেলে এ ধরনের চিন্তা করা যেতে পারে। কিসিঞ্জার চীন কেন গিয়েছিলেন তা সবার জানা। আর সিআইএ ও কেজিবি একসঙ্গে কোনো প্রস্তাব সমর্থন করেছে এটি অদ্ভুত থেকেও অদ্ভুততর। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যেসব দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র সবসময় পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছে।

যাক আখতারউদ্দিন মন্ত্রী হলেন। তাঁর মনে হলো, তাদের (অর্থাৎ মন্ত্রি সভার) কার্যক্রম স্থানীয় ও অস্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনলো, উৎপাদন গেলো বেড়ে। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হয়েছিলো, কেন্দ্রর সাহায্য না পেলেও পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতি ঠেকানো সম্ভবপর ছিল না।

আখতারউদ্দিনের এ মন্তব্য যে সর্বৈব মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংখ্যাতত্ত্বের কোনো হিসাবই তা সমর্থন করে না। তাঁর ভাষায়— "We were up against a gigantic conspiracy of global importance. And Bengal was a chessboard in that big game whether one watched or played."

১৮

আখতারউদ্দিন নিজেকে বা তাঁর মতানুসারীদের যোগসাজশকারী হিসেবে বিবেচনা করেননি। নিজেদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণা দেবার জন্য বেশ সুন্দর একটা নাম গ্রহণ করেছেন তা হলো 'পিসমেকার্স' বা 'শান্তিকারক', সেজন্য তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'আওয়ার রোল অব পিসমেকার্স'।

মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পরবর্তী অবস্থা তিনি বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায় সেনাবাহিনীর 'ক্র্যাক ডাউন' ও ভারতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের প্রবাসী সরকার গঠনের পর বেসামরিক জীবনযাত্রা আর কখনও স্বাভাবিক হয়নি। এখানে লক্ষণীয়, স্বাধীনতাকামীদের কিন্তু রাজাকাররা সব সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আখতার যা বলতে চাচ্ছেন তা হলো, তাঁরা মন্ত্রিসভা গঠনের পর শান্তির সূচনা হলো, মানুষের মাঝে ফিরে এলো নিরাপত্তা আর আস্থা। তিনি যেখানে যাচ্ছিলেন, সভা করছিলেন এবং সবাই যারা বক্তব্য রাখছিলো তারাই এ ধরনের কথা বলছিলো। এক সভায় তো একজন মন্ত্রী আখতারউদ্দিনকে লক্ষ্য করে বলেই ফেললেন, যে আদর্শের ভিত্তিতে দেশটি হয়েছিলো সে আদর্শের ভাঙন থেকে দেশকে বাঁচান। আমি আর কিছুই চাই না। আচ্ছা, পাকি এক মন্ত্রীর সভায় কি বক্তারা শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের কথা বলবে ? ঐ সভায় যেতো কারা ? মুক্তিযোদ্ধারা সভায় থাকলে আখতারউদ্দিনকে আর এই বই লিখতে হতো না। এ প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি জানাতে ভোলেননি যে, তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ঝালকাঠি ছিল তাঁর নির্বাচনী এলাকা। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, সেনাবাহিনী আসার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত ঝালকাঠি ছিল অস্ত্রধারী জনতার হাতে। সেনাবাহিনী এলে তারা পালিয়ে যায়। যেদিন সেনাবাহিনী যাচ্ছিলো নদীপথে সেদিন আখতারের অনুসারী আদম আলী কিছু লোকজন নিয়ে পাকি ফ্ল্যাগ হাতে সৈন্যদের অভ্যর্থনা জানায়। সৈন্যরা হাসিমুখে তার প্রত্যুত্তর দেয়। লোকজন শান্তির নিশ্বাস ফেলে ফিরে আসে। বাড়িতে বাড়িতে পাকি পতাকা উড়তে থাকে। কিন্তু, সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে 'আমর্ড মব অ্যাকটিভ' হয়ে ওঠে। আদম আলী ও তার ভাইকে হত্যা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আখতারউদ্দিনের মন্তব্য দেখুন— "The brutes left the place rejoicing over the ghastly and cowardly murders. The people were enraged but struck dumb for fear of victimization." তার পরের লাইনটি আরো সরেস— "Adam Ali and Rustam Ali had already joined the procession of death- the galayy of martxrs."

তাঁর ভাষায়, এ ঘটনার পর ঝালকাঠি শহর ঘৃণায় ও বিষাদে ডুবে গেলো। হানাদার বাহিনী এসে 'খুনি'দের খোঁজা শুরু করলো। অর্ধেক শহর তারা পুড়িয়ে দিলো। "কি করছে না জেনে তারা আমার ঘরবাড়ি ও মুসলিম লীগ অফিসও জ্বালিয়ে দিলো।" এ উক্তির মাধ্যমে তার অজান্তে দেশের অবস্থাটা তিনি তুলে ধরেছেন যদিও তাঁর উদ্দেশ্য তা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, মুক্তিবাহিনীর প্রতি ঘৃণা জাগানো। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর হাতে "অনেক লোক নিহত" হলো। তাঁর মন্তব্য "What a hatred of man against man. আফশোস করে লিখেছেন, রাজাকার ছাড়াও তার অনেক লোককে মুক্তিবাহিনী মেরেছে।

তিনি নিজেকে রাজাকার থেকে.আলাদা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "The outside world never know of this mass liquidation of thc vanquished by the victors." কিন্তু, "আমাদের মিশন ছিল হত্যা নয়, শান্তি ফিরিয়ে এনে বসবাস করা ও বসবাস করতে দেয়া। আমরা চেয়েছি ভারতের উসকানিতে মুক্তিবাহিনী ও প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে সেনাবাহিনী যে বাড়াবাড়ি করছে তা হ্রাস করা।" উল্লেখ্য মুক্তিবাহিনী শব্দটি ব্যবহার করলেই সঙ্গে ভারতের উসকানি এ শব্দ দুটি থাকবে।

তারপর তিনি ভারতের মুসলমানদের কাহিনী বর্ণনা করে শেষে লিখেছেন— "দ্বিজাতি তত্ত্ব ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান হতো না। আর পাকিস্তান থেকে একবার পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে গেলে, এ অঞ্চলের মানুষ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের সমস্ত প্রগতি থেমে যাবে যা এতোদিন তারা অর্জন করেছে। ইন্দিরা গান্ধী পূর্বাঞ্চলকে নিঃসঙ্গ বা আলাদা করতে চাইছেন যাতে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়ে। বা আরেকটি দুর্বল পাকিস্তান সৃষ্টি করতে। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের ধর্ম হারাবে, তারপর কী হবে ? চরম ফ্যাসিস্ট বা কমিউনিস্ট এক-নায়কত্বের পথ খুলে যাবে।" অর্থাৎ বাংলাদেশ হলে মুসলমানরা ধর্ম হারাবে। ধর্মের এই জুজুর ভয় দেখানো বা ধর্মব্যবসা ছিল রাজাকারদের সবসময়ের মূলধন। এ ব্যবসা রাজাকাররা সবসময় করেছে এবং এখনও করছে। না হলে কিসের ভিত্তিতে তারা টিকে থাকবে ? এটি যে ব্যবসা তার বড় প্রমাণ, আজ ত্রিশবছর পরও কি বাংলাদেশ ভারতের অংশ হয়ে গেছে, নাকি মুসলমানরা ধর্ম হারিয়েছে, নাকি প্রগতির দিকে এগিয়েছে ? অন্যদিকে, পাকিস্তান কিন্তু সবদিক থেকে পিছিয়েছে এবং পৃথিবীতে ক্রমেই একটি 'অচ্ছুত' রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

আখতারউদ্দিন ১৯৭০ সালে, পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেছেন, কথা হচ্ছে, পুরনো কথা ভুলে নতুনভাবে অগ্রসর হওয়ার। খালি বাঙালিরাই কোনো যুক্তি শুনতে রাজি ছিল না।

নতুন সরকার গঠনের পর মালেক মন্ত্রিসভা দেশের জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করেছিলো। তা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যাতে বিদেশী [অর্থাৎ হিন্দু বা ভারতীয়] সংস্কৃতি ও এর খারাপ প্রভাব লুপ্ত করা যায়। এককথায়, রাজাকারি ভাবধারা যেন প্রোথিত করা যায়।

১৯

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম— 'পাকিস্তানের আদর্শ ও শসনতন্ত্র' এবং 'শাসনতান্ত্রিক বিরোধিতা'।

এ দু'টি অধ্যায়ে মূলত ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা, পাকিস্তান গঠনের ইতিহাস, আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তার ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকেই জানতে পারি আখতারউদ্দিন প্রথমে জামায়াত, তারপর মুসলিম লীগ হয়ে ১৯৬২ সালে নির্বাচনে জিতে আবার ফিরে যান জামায়াতে। আমরা এই ঘুরপাক খাওয়াকে সুবিধাবাদ বলতে পারি কিন্তু আখতারউদ্দিন জানিয়েছেন, এ ঘুরপাক খেয়েছেন আদর্শের কারণে। যেহেতু তিনি জামায়াতের নেতা সেহেতু তাঁর ইতিহাস বর্ণনা হয়েছে খণ্ডিত। অবশ্য, তিনি আইয়ুব খানের সমালোচনা করেছেন। পুরো বিবরণের সারাংশ দেয়ার দরকার নেই। কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতিই বুঝতে সাহায্য করবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

১. আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা ঘোষণা করে প্রায় পুরো পূর্ব পাকিস্তানই জয় করে ফেলেন। ৬ দফা গোপনে অনুমোদন করেছিলো মার্কিন ও ভারতীয় কূটনীতিবিদরা। ড্যাক তা অনুমোদন করেনি।

২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করলো। এই মামলায়, তাঁর ভাষায়—

"India's design to aid secession of East Pakistan through armed upsising of Bengalee forces became crystal clear in this case."

এ কারণে, আওয়ামী লীগকে বিদেশের সঙ্গে মিলিয়ে ষড়যন্ত্রকারী কেউ মনে করেনি বরং আওয়ামী লীগ এ থেকে লাভবান হয়েছিলো ও আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি অর্জন করেছিলো।

তারপর এলো নির্বাচন। আখতারের ভাষায়— নির্বাচন বা 'ফ্যাসিজম' (সপ্তম অধ্যায়)। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে তিনি অবাধ নির্বাচন মনে করেন না, মনে করেন ফ্যাসিজম। কেন ?

সে সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, মনজুর কাদের ও তাঁকে শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডেকে পাঠান ও শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রণয়নের নির্দেশ দেন। এক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছিলো তাঁদের। এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুসরণ করে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খসড়া শেষ করেন। খসড়া অনুমোদনের পর তা পাঠানো হলো মুদ্রণের জন্য। ঠিক হলো, সংসদ ডাকা হবে। আখতারউদ্দিন ফিরে এলেন ঢাকায়।

ঢাকায় এসে অবাক হলেন। গোলটেবিল বৈঠকে যেতে মুজিব অস্বীকার করলেন, গোলটেবিল ব্যর্থ হলো। চরমপন্থী দল যেগুলি 'ড্যাক'-এর বাইরে ছিল সেগুলি সমর্থন করলো মুজিবকে। 'in his unholy breach of faith"

এরপর তাঁর ভাষা লক্ষ করুন—

"শ্রমিক, ছাত্র, জনতাকে আবার আইনভঙ্গের জন্য রাস্তায় নামতে বলা হলো। বলা হলো জাতীয় সম্পদ ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পদ ভস্ম করতে ; স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প কারখানা বন্ধ করতে।" ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনকে আখতারউদ্দিন এভাবে বিচার করেছেন।

শেখ মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত হলেন, কিন্তু, "এটি তাদের বা ভারতের জন্য মুক্তি ছিল না।" পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হতে পারে সেজন্য ভারত অস্ত্র সরবরাহ করছিলো। মামলা শেষ হওয়ার পরেই এই ঝামেলা (অর্থাৎ গণআন্দোলন) শুরু হয়।

তারপর ইয়াহিয়া খান এলেন ক্ষমতায়। নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। শুরু হলো দলগুলির প্রচারাভিযান। কিন্তু, সবখানে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের উগ্র সমর্থকরা অন্যান্যদের মিটিং মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিতে লাগলো। আখতারউদ্দিন মুসলিম লীগের হয়ে জনসভা করতে গিয়ে প্রহৃত হলেন।' কিন্তু, "তারচেয়েও শকিং যে, পুলিশ আমাদের গ্রেফতারকৃত ৪০ জনের মধ্যে ৩০জনকে সমর্পণ করলো সামরিক আদালতে ভিকটিমাইজ করার জন্য।"

আখতারউদ্দিনের ভাষায়— "বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধ শুরু হলো। নির্বাচনের জন্য শেষ পর্যন্ত সংগঠিত গ্রুপসমূহ তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগলো। দিতে লাগলো হুমকি, সৃষ্টি করলো ভায়োলেন্স। আরো কয়েকটি জেলায় মিটিং করতে গিয়ে এইরকম ফ্যাসিস্ট ধারার মুখোমুখি হতে লাগলাম।" কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, ভায়োলেন্সের মাধ্যমে কি সমর্থন আদায় করা যায় যেমন সমর্থন আদায় করেছিলো আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে ? বা আওয়ামী লীগ যদি এ ধরনের ভায়োলেন্সের আশ্রয় নিতো তা হলে একচেটিয়া সমর্থন পেলো কীভাবে নির্বাচনে ? এসবের উত্তর নেই তাঁর লেখায়।

আখতারউদ্দিন লিখেছেন, নির্বাচনের আগে সারা দেশে প্রচারাভিযান এমন ভাষায় এমনভাবে চললো যে তা বিস্ময়কর! প্রচারাভিযানের মূল কথা ছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দুধ ও মধুর নহর বইয়ে দেবে। কিন্তু এ ধরনের উক্তির কারণ কী ? তাঁর ভাষায়, এতো প্রচারের টাকা এলো কোত্থেকে ? এর অনুক্ত উত্তর হচ্ছে, ভারত আওয়ামী লীগের প্রচারে টাকা ঢেলেছে।

ভোটের সময় আওয়ামী লীগ মরিয়া হয়ে উঠলো— "They combined in them all the fascists traits of publicity, pressure and force of Hitler, so much so that on the voting day they had the monopoly of election agents, polling, and presiding officers, and voters in the booth."

চরম জালিয়াতি হলো। ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট হিন্দুরা নৌকায় ভোট দিলো, প্রয়োজনে ভোট জাল করলো। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী অসহায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ করে রইলো। আখতারউদ্দিন ভোটারদের বলেছিলেন "ছয় দফার বিজয়ের ফল একটিই : বিচ্ছিন্নতাবাদ। এতে ভারতের লাভ হবে বেশি, তোমাদের ক্ষতি হবে তারচেয়েও বেশি।"

আমরা যারা ঐ সময় ভোট দিয়েছি তারা ঐ সময় আখতারউদ্দিনের এই কাল্পনিক দৃশ্যের মুখোমুখি হইনি। মানুষ স্বাধিকার চেয়েছিলো। গণ-আন্দোলনের পর তাদের ইচ্ছা আরো দৃঢ় হয়েছিলো এবং ছয়দফাকে তাদের বাঁচার দর্শন মনে করেছিলো। আওয়ামী লীগ যেহেতু ছিল ছয় দফার প্রবক্তা সেজন্য সবাই ভোট দিয়েছিলো আওয়ামী লীগকে। কেউ ভোট নষ্ট করতে চায়নি।

এর পরের ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়ে, পাকিরা সাধারণত যে সিদ্ধান্ত পৌঁছে তিনিও সে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ইয়াহিয়া নিজের ক্ষমতায় আস্থাবান ছিলেন, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে শ্লাঘা অনুভব করছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। তাঁর ভাষায় "Mujib was carried away by the skillfully designed Indian conspiracy of dismembering Pakistan in the name of full autonony for Bengalees."

ইয়াহিয়া নতি স্বীকার করলেন। শেখ মুজিব ভারতীয় আশীর্বাদে পূর্ব পাকিস্তান শাসন করতে চাইলেন।

"An unknown ship was to wait in Chittagong out harbor to carry people or relay messages."

শেষ বাক্যে আমরা আবারও আখতারউদ্দিনের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই।

২৫ মার্চের ঘটনাবলী আখতারউদ্দিন বর্ননা করেছেন 'নাইটমেয়ার অব ক্র্যাক ডাউন'-এ। হামুদুর রহমান কমিশনে ২৫ মার্চের পাকিদের তাণ্ডবের যে যৌক্তিকতা দেয়া হয়েছে লেখকও তা-ই তুলে ধরেছেন।

তাঁর বিবরণটি এরকম— ঢাকা, সৈয়দপুর, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ, বিরোধীদের নাজেহাল করতে লাগলো, লুট হলো বন্দুকের দোকান, বিহারিদের সম্পত্তি লুট করে হত্যা করা হলো তাদের। ধর্ষিত হতে লাগলো বিহারি তরুণীরা। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল পরিণত হলো সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের দুর্গে। সবখানে দেখা গেলো ভারতীয় এজেন্টদের। তারা হাজির ভারতীয় মুদ্রা ও সামগ্রী নিয়ে। অনেকে তাদের গ্রহণ করলো পরম বন্ধু হিসবে। ২৩ তারিখ শেখ মুজিব স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের পতাকাসহ কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণ করলেন। বোঝা গেলো বিচ্ছিন্নতার জন্য তিনি প্রস্তুত।

মার্চ-এপ্রিলে বিহারিহত্যা হয়েছিলো না বাঙালিহত্যা? মার্চ, ১৯৭১ সালে লন্ডনের অবজারভারে সিরিল ডানের এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারফিউভঙ্গের জন্য মানুষকে গুলি করা হচ্ছিলো। এবং কার্ফু কারা ভঙ্গ করছিলো? বিহারি না বাঙালিরা? ডান লিখেছেন—

"Our correspondent puts the death toll at 'about 200' and says this relatively low figure is due to the restraint so far shown by the Army, even though angry crowds are everywhere defying the curfew imposed on the province. The Sheikh has appealed to his people to calmdown and to do nothing to aggravate the crisis unles they get his orders to behave differently."

বিহারিহত্যার প্রসঙ্গটা বিস্তৃত আকারে উল্লেখ করার কারণ আছে। সমস্ত পাকিস্তানিরা এ বিষয়টি বিশ্বাস করে কারণ ১৯৭১ সালে তাদের তা-ই বোঝানো হয়েছিলো এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

মার্চের শেষ সপ্তাহে আমি মিরপুর ছিলাম। বিহারিরা কীভাবে বাঙালিদের কচুকাটা করেছে তা আমরা দেখেছি। ঢাকায় [এবং মীরপুরেও] যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছে কমিশনের বক্তব্য হাস্যকর মনে হবে না? বিহারিদের একটি বড় কলোনি ছিল সৈয়দপুরে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ.টি.এম. হামিদুল হোসেন তারেক 'জলছবি ৭১'-এ লিখেছেন—

"...১৯৭১-এর দিনগুলোতে স্থানীয় বিহারিদের বাঙালি বিদ্বেষপ্রবণতা প্রকটভাবে দেখা দেয়। প্রায়ই কোনো-না-কোনো অজুহাতে বাঙালি 'কতল' করা ফন্দি ওরা খুঁজে বেড়াত। এরই জের হিসেবে ৪ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে স্থানীয় বিহারিরা সৈয়দপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে মলমূত্র লেপে রাখে। পরের দিন, এই সংবাদ সব গলিতে গলিতে ছড়িয়ে

পড়লে সৈয়দপুরের বাঙালিরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে বিহারিরা পাল্টা মিছিল বের করে। শহরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়'। ২৫ মার্চ গোপন সূত্রে খবর এলো অনেক বাঙালিকে রেলওয়ের ওয়ার্কশপের জ্বলন্ত বয়লারে পুড়িয়ে মেরেছে।

ভোর রাতে বিহারিদের আক্রমণ এলো। ওরা বাড়ির প্রায় চতুর্দিক থেকে 'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর' বলে আক্রমণ করল। শটগান ও রাইফেলের অবিরাম গুলি চালাতে লাগল বাড়ি লক্ষ্য করে।"

হামুদুর রহমান কমিশনেও বারবার বিহারিহত্যার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশন বিশ্বাস করে, ১,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ বিহারি বা অবাঙালি হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশে এবং তার জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ। রাজাকাররাও তাদের রচনায় বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেননা তারা বলতে চাচ্ছে, এই অবাঙালি হত্যার কারণেই সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাস্তায় নেমে এসেছিলো। এবং ২৫ মার্চের গণহত্যা এ কারণে যৌক্তিক।

তারপরের বর্ণনা আরো চিত্তাকর্ষক। সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের জন্য ৩২ নম্বর গেলো। মুজিব সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। "আমাকে বা আমার সন্তানদের গুলি কোরো না। আমাকে বন্দি হিসেবে নিতে পারো।" কাঁপাকাঁপা গলায় তিনি বললেন। জওয়ানরা তাঁর শরীর সার্চ করলো কিন্তু কর্নেল খান ও মেজর বিল্লাহ লক্ষ রাখলেন যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।"

২৫ মার্চ কী হলো ? গুজব শোনা গিয়েছিলো ঢাকায় প্রায় হাজারখানেক লোক মারা গেছে। আখতার ছিলেন গুলশান। সেখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আগুন দেখে ও গোলাগুলির শব্দ শুনে এ গুজব তাঁর কাছে সত্য মনে হয়েছিলো। কিন্তু, আসলে মারা পড়েছিলো কয়েকজন, নদীতেও পাওয়া গিয়েছিলো কয়েকটি লাশ। সাংবাদিকদের বের করে দেয়া হয়েছিলো। ফলে, তাদের আত্মশ্লাঘায় লেগেছিলো। নিজ নিজ পত্রিকায় তারা ছাপতে লাগলো গুজব। আখতারের ভাষায়— "A few dead bodies were found in Dacca and in the adjoining river but taking the sound and fury the high flames and rumour into account, it was guessed that thousands of people, must have been finished by the army."

আসলে, আখতারউদ্দিনের মতে, গণহত্যা চালানো হয়েছিলো অবঙালি বিশেষ করে বিহারি, পাঠান এবং পাঞ্জাবিদের ওপর যাদের বলা হতো বিহারি। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পরিকল্পিত এই গণহত্যা শুরু হয়। মহিলাদের

ওপর অত্যাচারটা ছিল বিশেষত্ব। এদের অনেককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে উদ্ধার করা হয়। এপ্রিলের আগে মফস্বল এলাকা থেকে এসব হতভাগাদের উদ্ধার করা যায়নি। তাঁর ভাষায়— "Torture of women became a corollary of this plan; even in Dacca young women were recovered from some halls and houses by the army on or after the twenty-fifth of march crackdown... this tale of woe and suffering in some of which was caught in still and movie cameras, still in custody of journalist and government of Pakistan was not amply projected to the world to avoid quiter reactions, after march 25. against the Bengalis in west Pakistan."

ঠিক একই বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে কুতুবউদ্দিন নামক এক বাঙালি-বিদ্বেষী পাকি সাংবাদিকের বইতে। তারপর তা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে হামুদুর রহমান কমিশনে। হয়ত আখতারের বর্ণনার উৎস কুতুবউদ্দিনের বই। কিন্তু, যে বিষয়টি উল্লেখ্য, এরা যে যেখানেই থাকুন না কেন মার্চের পটভূমি ও গণহত্যা সম্পর্কে তাদের বিবরণ একই। রাজাকারের চিন্তার সাযুজ্য একেই বলে। বা এটিই হচ্ছে রাজাকারের মন। ধর্মের নামে মিথ্যা বয়ানই রাজাকারের ধর্ম। শুধু 'বক ধার্মিক' বললে এদের প্রশংসা করা হয়। আখতারউদ্দিন এই মিথ্যাচারের পর লিখেছেন, এইসব হত্যা ও ২৫ মার্চের "আর্মি অ্যাকশন" (লক্ষ করুন হত্যা নয়) তাঁকে শান্তির পক্ষে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর ভাষায় শান্তির সপক্ষে কাজ করার বিষয়টি নাটকীয়তা লাভ করেছে। বেশ একটা কাব্যিক ভাব এসেছে— "I had the misfortune to witness some of these live and dead victims; also their pictures. These killings, along with those took place after the twenty fifth as a result of army action, confirmed my anguish and shame against human killings in the name of war or revolution, political or communal upheaval; it further deepened my conviction to work for peace and tranquility at any cost."

এরপর আছে কিছু দার্শনিক স্বগতোক্তি। তারপর উল্লেখ করেছেন। বরিশালে বড় আকারে পাকিস্তানপন্থী মানুষদের হত্যা করা হয়নি। তবে, বিহারিদের হত্যা করা হয়েছে। ফলে, সেনাবাহিনী এলো, স্থাপন করলো কর্তৃত্ব। এ সময় যে কিছু ঝামেলা হয়নি তা নয়। তবে, হলো কী এরাতো বহিরাগত, কে কার পক্ষে জানতো না। ভাষাও জানতো না— "they would look for a suspect in a hindu or a young man, which terrorized every

once." তো অনেকেই ভারতে পালাতে লাগলো। কিন্তু কীভাবে ? তোষাখানা ব্যাংক লুট করে, সরকারি গাড়ি বা সম্পদ নিয়ে। পুরো বিবরণটি পর্যালোচনা করুন, দেখবেন রাজাকাররা কীভাবে চিন্তা করে।

২০

শেখ মুজিবের প্রতিনিধিত্বকারী লোকদের মারফত ভারত ১৭ এপ্রিলের মধ্যে তার পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কার্যকর করলো। ঐ দিন তারা একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করলো যেখানে দেয়া হলো স্বাধীনতার ঘোষণা। যে জায়গাটায় এ ঘোষণা দেয়া হলো তার নাম দেয়া হলো মুজিবনগর। আখতারউদ্দিন বলছেন, অনেকে যে বলে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে ২৬ তারিখ (মার্চ) আসলে তা ঠিক নয়। ঠিক তারিখ হচ্ছে ১৭ এপ্রিল এবং এর মাধ্যমে ভারত আরেকটি জয় পেলো। প্রতিবেশী পাকিস্তানকে পঙ্গু করার অনেকদিনের সাধ তার পূর্ণ হলো।

গুজব রটেছিলো যে, সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের সমস্ত সক্ষম লোকদের হত্যা করেছে আর সব বাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, আখতারউদ্দিন দেখলেন, ২৭ তারিখও লোকজন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছে। ঘরবাড়িও মাটিতে মেশানো হয়নি।

এ ধরনের ভাষ্যের কী জবাব হতে পারে ? ২৭ মার্চ মানুষ হাঁটাহাঁটি করছিলো না ঢাকা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছিলো ? নয়াবাজার, শাঁখারিবাজারে কী হয়েছিলো ? কিন্তু, আখতারউদ্দিনরা বই লিখেছেন বিদেশীদের জন্য। এ ধরনের ভাষ্যে তাদের মনে হতে পারে ২৫ মার্চের ঘটনাটা অতিরঞ্জিত। এবং এ বিষয় প্রমাণের জন্য আখতারউদ্দিন একটি গল্প ফেঁদেছেন।

বরিশাল থেকে একজন এসে তাঁকে জানালো যে, সে শুনে এসেছে, ঢাকার অবস্থা আর্মি এমন করেছে যে, সদরঘাটে দাঁড়ালে বায়তুল মুকাররম দেখা যায়। কিন্তু, সে সদরঘাট গেছে এবং দেখেছে কথাটা ঠিক নয়। সে শুনেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নাকি এমনটি ঘটেছে। আখতারউদ্দিন তাকে দেখে আসতে বললেন। সে ফিরে এলো, চোখে, মুখে হতাশা। কারণ, যা শুনে এসেছে তা সত্যি নয়। আখতারের মতে, অতিরঞ্জন যে শুধু এখানে হয়েছে তা নয়, বিদেশী পত্রিকাগুলিও অতিরঞ্জন করেছে।

এসব পড়লে বলতে ইচ্ছা হয়, হারামজাদা, সদরঘাট থেকে দু'পা এগুলে শাঁখারিবাজার, তাঁতিবাজার, নয়াবাজারের কী হাল হয়েছিলো ? মারা যায়নি এখানে হাজার হাজার লোক ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণকবর দেয়া হয়নি ? এসব লোক যারা পাকিদের শুকতলা চুষে আনন্দ পায়, তাদের জ্ঞাতার্থে বলি পাকি ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী কী বর্ণনা দিয়েছেন সেটি দেখতে। সিদ্দিকী লিখেছেন— "Dacca, on March 26 and for several day to come, was virtually a media men's paradise. It was the picture of death and desolution. Every dead body by the road side, every bombed out building, every barricade, every tank and jeep, was a story for the avaricious TV man and news photographer : and they missed nearly all that." তিনি আরো লিখেছেন, পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য শ্বেতপত্র প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হলো। নির্মিত হলো ডকুমেন্টরি 'দি গ্রেট বিট্রেয়াল'। এ ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা করলেন বাঙালি অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরী। ইয়াহিয়া ও জেনারেলরা ছবিটা দেখলেন। ছবি শেষ হলে ইয়াহিয়া প্রশ্ন করলেন, "I hope all the devastation shown in the film is not result of army action."

আখতার লিখেছেন, নেতা ও শিষ্যরা পালালেন ৭ কোটির কোনো খোঁজ না করে। এরই মধ্যে করা হলো স্বাধীনতার ঘোষণা। সেনাবাহিনীর তখন তো আর করার কিছু ছিল না, কারণ— "For the army now it was a point of no return, as it was no longer a question of establishing law and order in the aid of civil authority, but it was fighting a rebellion that was hitherto covert but no dangerously overt" ভারতে কারা গিয়েছিলো ? কারা আবার, আখতারউদ্দিনের মতে, হিন্দুরা, 'ভোকাল' যুবক এবং আওয়ামী লীগাররা। বিদ্রোহী বাহিনী, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষজন এবং 'অ্যাকটিভ এজেন্ট'রা।

এ মিথ্যাচার এখানেই শেষ হয়নি। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, শান্তিপ্রিয় মানুষরা সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহীদের 'ক্রসফায়ারে' পড়ে অনিরাপত্তায় ভুগতে লাগলো, তখন প্রথমে ঢাকা ও পরে অন্যান্য এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও মানুষজনকে সহায়তা করার জন্য শান্তি কমিটি গঠন করতে লাগলো। এখানে বিহারিরা যে সেনাবাহিনীর সহায়তায় গণহত্যা করছিলো তা একটি বাক্যে বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন। তবে, মূল বক্তব্য হলো শান্তি কমিটি শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলো। আখতারউদ্দিনের সবসময় মনে হয়েছে, ইয়াহিয়া ছিলেন অদূরদর্শী আর মুজিব বিপথগামী এবং দু'জনই ছিলেন অন্যের ক্রীড়নক। যাহোক, আখতার শান্তি কমিটিতে যোগ দিলেন এবং বেশুমার লোককে সাহায্য করলেন। তাঁর ভাষায়—

"Ultimately, I offered my humble services for those helpless people. I am glad that I could actually help countless of them." পাকিরা কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছিলো, কিন্তু গণহত্যা, না, গণহত্যা কখনও করেনি। মন্তব্যটি হামুদুর রহমান কমিশন বা পাকিদের মতো লাগছে না ? লাগাটাই স্বাভাবিক। এদের একমাত্র আফশোস, কেন তাদের জন্ম হলো না পাকিদের ঔরসে। তাঁর ভাষায়— "It was never genocide or mass crime. as has been represented to the world by the courtsey of Indian or pro-Indian publicity media."

তারপর আসছে বাস্তুহারাদের প্রসঙ্গ। ভারত তো বাস্তুহারাদের নাম করে প্রচুর ত্রাণ সাহায্য পেয়েছে কিন্তু সেগুলি লোপাট হয়েছে। দুর্নীতির কারণে লুটপাট হয়েছে। পাকিস্তান যখন ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলো তখন অনেকে ফিরে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু ভারতসৃষ্ট "Physical and psychological' কারণে তারা আসতে পারেনি। আখতারউদ্দিনের কখনও মনে হয়নি, পাকিস্তানের ক্ষমার কেয়ার থোড়াই তখন কেউ করছিলো।

তিনি জানাচ্ছেন, পুলিশদের সাহায্য করার জন্য আনসারের জায়গায় সৃষ্টি করা হয়েছিলো রাজাকারদের। 'আনঅফিশিয়ালি' এদের দু'টি শাখা ছিলো—আল-বদর ও আল-শামস। এদের দেয়া হয়েছিলো স্বল্পমেয়াদি ট্রেনিং। রাজাকারদের প্রাথমিক সংখ্যা ছিল ২৫,০০০। পরে তা বৃদ্ধি করা হয় ৫০,০০০। সেনাবাহিনীর অধীনে এদের ন্যস্ত করা হয় অগাস্টে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে যেসব নাশকতামূলক কাজ হচ্ছিলো, সেগুলি করছিলো ভারতীয় সেনাসদস্যরা। তাদের সাহায্য করছিলো স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা। বিশ্বাবাসী জানতো না, হাজার হাজার ভারতীয় সেনাকে সিভিলিয়ান বেশে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এদের অনেকের সঙ্গে আখতারের কথাবার্তা হয়েছে ঢাকা জেলে। এরকম কল্পকাহিনী আর কোনো রাজাকারের বইয়েও দেখিনি। অখতার অবশ্য বলেননি এরা ঢাকা জেলে এলো কীভাবে।

হানাদার পাকিবাহিনী-অধিকৃত বাংলাদেশে নির্বাচন হয়েছিলো। যেহেতু আওয়ামী লীগ ছিল নিষিদ্ধ সেহেতু মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপি প্রভৃতি নির্বাচনে অংশ নেয়। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আওয়ামী লীগের বেগম সোলায়মান, জহিরউদ্দিন, ফয়জুল হকও এ বিষয়ে ভূমিকা রাখেন। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হলে এঁরা কীভাবে গণতন্ত্র চর্চায় ভূমিকা রাখলেন সে প্রশ্ন অবশ্য অনুক্ত থেকে যায়। আর বেগম সোলায়মান বা ফয়জুল হক কবে থেকে আওয়ামী লীগার ছিলেন— জানি না। তাঁদের পিতা সোহরাওয়াদী বা ফজলুল হক কিংবদন্তিতুল্য রাজনৈতিক ছিলেন সত্য কিন্তু এঁরা ছিলেন পিগমি যে কারণে রাজাকারের ভূমিকা গ্রহণ করতে তাঁদের বাধেনি। যাহোক, আখতার

জানাচ্ছেন, আসন ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেলো। পরে, "শান্ত, নিরীহ, ধর্মপ্রাণ রাও ফরমান আলি" তা মিটমাট করলেন। কীভাবে, সেটা আখতার উল্লেখ করেননি। কিন্তু করেছেন রাও ফরমান। তিনি লিখেছেন ও বলেছেন, অর্থ দিয়ে, ধমক দিয়ে, সিট ভাগাভাগি করে দিয়েছিলেন এবং তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ এটি ছিল প্রহসনমূলক নির্বাচন।

এভাবে শান্তি ফিরে এলো। আর ইন্দিরা গান্ধীর তো তা কাম্য ছিল না। তিনি দেখলেন, তাঁর পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে। তাই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি অন্তিম আঘাত হানতে চাইলেন।

২১

'উন্মুক্ত আগ্রাসন' হচ্ছে নবম অধ্যায়ের শিরোনাম। ২০ নভেম্বর ভারত শান্তির ও মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলো তা ভেঙে ফেললো, পাকিস্তানের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে। আসলে,পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশী প্রচারমাধ্যমকে তারা বোঝাতে চেয়েছিলো, তারা এখন বাধ্য হয়ে আক্রমণ করছে, আগে করেনি। অন্যদিকে, পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর কঠোর নির্দেশ ছিল ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ না করার। করলেও তা করতে হবে 'হট পারস্যুট' বা স্বল্প সময়ের জন্য। এ ধরনের কঠোর আত্মরক্ষামূলক নীতিই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধের শুরুতেই যদি পাকিস্তান ভারতীয় কিছু নদী/পর্বত-এর মতো 'স্ট্র্যাটজিক পয়েন্ট' দখল করে নিতো তা হলে আত্মরক্ষার সুযোগ পেতো।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করলো ঢাকা বিমান-বন্দর। এবং তাদের বেশ কিছু বিমান ও পাইলট হত হলো। 'The whole country was thrilled by this success and practically every body openly came out against Indian agression."

এ কাল্পনিক চিত্র আখতার কোথায় পেলেন তিনিই জানেন। তিনি আরো জানাচ্ছেন, আওয়ামী লীগ ও দিল্লীর গোপন চুক্তি কার্যকর করা হলো পাকিস্তান ভেঙে কাশ্মীরের আদলে বাংলাদেশ নামে পুতুল সরকার বসানোয়।

এ বিবরণেই আবার অপ্রাসঙ্গিকভাবে টিক্কা খানের গুণ গেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, টিক্কা লাভ করেছিলেন একটি উত্তপ্ত পরিস্থিতি যেখানে— "One hut burned carried a bad name for one thousand, one rape or man handling

of a woman earned a bad name for ten thousands, one soldier killed earned the wrath a thousand and one Bengali killed earned the hatred for thousands."

যাহোক ১৪ ডিসেম্বর মালেক মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক বসলো যা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। কী আলোচনার জন্য ? যুদ্ধের হত্যালীলা, ধ্বংস, রক্তপাত বন্ধ করার জন্য। বাংলার মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান যা করেছে দু'দশক তা রক্ষার জন্য।

পাকিরা বাংলার মুসলমানদের জন্য কী করেছিলো তা অবশ্য জানতে পারি না বিশদভাবে। তবে, তাঁর বিবরণে এক জায়গায় লিখেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যে কলকারখানা রাস্তাঘাট হয়েছে তা পাকিদের জন্য। এটা অবশ্য উল্লেখ করেননি, পুরো পাকিস্তানের যা অর্জন তার সিংহভাগের টাকা যুগিয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তান। আমাদের টাকায়ই যে করাচির উন্নয়ন ও ইসলামাবাদ গড়ে তোলা হয়েছিলো তা অবশ্য আখতারউদ্দিনের মনে ছিল না।

২২

পাকিদের আত্মসমর্পণ আসন্ন। আখতারউদ্দিন ও অন্যান্য রাজাকাররা রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ অঞ্চল তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধবিরতি ছিল আসলে আত্মসমর্পণ, আর ভারতীয়রা তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলো যাতে তারা পাকিস্তান থেকে অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানের সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার এটিই ছিল সুযোগ। শুধু তাই নয়—

"the Mukti Bahini, the miscreants, the fortune seekers, time servers, all would be active in siding the bandwagon.

অর্থাৎ, স্বার্থান্বেষী, দুস্কৃতকারীদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তফাত নেই। অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ, পাকিস্তানিরা সবসময় মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় ট্যাংক, যোদ্ধারা ঢাকায় প্রবেশ করলো যেন প্যারিস বা ওয়ারসতে জার্মানরা প্রবেশ করছে। এখানেও আখতার ভারতীয় বা মিত্রবাহিনীকে বা যৌথবাহিনীকে তুলনা করেছেন নাৎসিদের সঙ্গে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্যারিস বা ওয়ারসতে যখন নাজিরা প্রবেশ করছিলো তখন কি

পারিবাসী বা ওয়ারসর মানুষজন মালা হাতে ছুটে গিয়েছিলো ? যায়নি। ঢাকায় তা হয়েছিলো। এখানেই ছিল নাজিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। নাজিরা এসেছিলো দেশ জয় করতে। মিত্রবাহিনী এসেছিলো সাহায্য-কল্পে।

আখতারউদ্দিন অবাক হয়েছেন শুনে যে, পাকিদের যোগসাজশকারী হিসেবে অনেককে রাস্তায় টেনে আনা হচ্ছে, অত্যাচার করা হচ্ছে, মুক্তিবাহিনী ও তাদের সমর্থকরা হত্যা করছে। সারাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হতে লাগলো।

"This crime against humanity continued openly in the streets and houses, huts and bazars, villages and towns, all over country." লক্ষ করুন, "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" শব্দটি। পাকিরা তা হলে এ থেকে মুক্ত ছিল। আখতাররা এ ধরনের সংবাদ আরো শুনতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য, বিদেশী প্রচারমাধ্যম চুপ। অথচ, এর চেয়েও কম নিষ্ঠুরতা নিয়ে কত-না হৈচৈ হয়েছে!

এ অনুচ্ছেদেই স্পষ্ট বোঝা যায় বাঙালিদের প্রতি বা মানুষদের প্রতি রাজাকারের দৃষ্টিভঙ্গি। পাকিরা হত্যা ধর্ষণ লুট করলে তা কিন্তু মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হয় না!

আখতারউদ্দিনের মতো যোগসাজশকারীদের এরপর ভারতীয় সেনাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। আমরা বলবো, জনতার ক্রোধ থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হলো। ভাগ্যের পরিহাস, হিন্দুস্থানের সেনারাই মানুষের ক্রোধ থেকে তাদের বাঁচালো, তাদের দেবতা পাকিরা নয়। হিন্দুস্থানের সৈন্যরা নিয়ে চললো তাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। কিন্তু, এ বিবরণেরও দু'একটি অনুচ্ছেদ আছে যাতে বোঝা যায় পাকিরা কেন তাদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে না এ দুঃখে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছিলো। একটি কাহিনী এরকম—

আখতার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছিল নয় বছরের মেয়ে জেবা ও পাঁচ বছরের ছেলে হাসান। তারা ভারতীয়দের পোশাকআশাক দেখে 'ইমপ্রেসড' হয়নি। বরং পাকিদেরই 'স্মার্টার' মনে হয়েছে। রাজাকার পরিবারের সন্তানদের চিন্তাও কীভাবে পরিচালিত হয় এটি তার একটি উদাহরণ। পাঁচ বছরের ছেলেটি আরো বলছিলো, তাদের পাকি গার্ড শের খান থাকলে এসব "টাইনি ইন্ডিয়ানস"দের হটিয়ে দিতে পারতো। ছেলেটি যখন জানলো শের খান বন্দি তখন সে বললো, চিন্তা না করতে। শের খান সৈন্যদের নিয়ে এসে তাদের মুক্ত করবে।

শেরখানরা আর আসেনি। "পিচ্চি ভারতীয়" ও বাঙ্গালিদের মারের চোটে তারা তখন বিল্লি খান। রাজাকারদের নিয়ে ভাবার সময় তাদের ছিল না।

যাক, ক্যান্টনমেন্টে তারা হিন্দুস্থানী সেনাদের তাঁবে থেকে বেশ পিকনিক পিকনিক অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলেন। এরই মধ্যে আখতার শুনলেন ১৪ ডিসেম্বরের হত্যাকাহিনী। এ সম্পর্কে তাঁর বয়ান শুনুন।

১২ তারিখে টাঙ্গাইলের পতনের পরই ধরে নেয়া যেতে পারে পাকিদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। ১৪ তারিখ ঢাকায় এবং ১৫ তারিখ সরকারিভাবে তা নিয়াজী মেনে নিলেন। সুতরাং পরাজিত পাকিরা কী করে এরই মধ্যে এরকম একটা পরিকল্পনা করে তা কার্যকর করতে পারে ? লাভ কী তাদের ? নাকি পাকিস্তান বা ভারতের কোনো চরমপন্থীরা এটা করেছে? যারা নিহত হয়েছে তাদের অধিকাংশ ভারতপন্থী ছিল না এবং মুক্তিযুদ্ধে তারা যোগও দেয়নি—" will there ever be any impartial inquiry and trial besides the motivated propaganda?"

উপর্যুক্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদে আখতারউদ্দিন আসল কথা বলেছেন, বুদ্ধিজীবীরা ভারতপন্থী ছিল না এবং মুক্তিযুদ্ধেও যোগ দেয়নি। ইঙ্গিতটা হলো— ভারতীয়রাই এ কাজটি করেছে। "উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা"র অর্থ সবাই বলে ভারতীয়রা নয়, পাকিরা এটা করেছে।

উল্লেখ্য, পাকি নীতিনির্ধারক, হামুদুর রহমান কমিশন ও আখতারের বক্তব্যে কোনো তফাত নেই এবং সেটাই স্বাভাবিক।

তাঁর মতে, আরেকটি উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা হলো— পাকি সেনাবাহিনী এখানকার কলকারখানা, রাস্তাঘাট ধ্বংস করেছে আত্মসমর্পণের আগে। আসলে, তাঁর মতে, বৃটিশ আমল থেকেই বাংলাদেশে কিছু গড়ে ওঠেনি। হ্যাঁ, পাকিরা ঢাকায় কিছু বাড়িঘর, বাজার ধ্বংস করেছে এবং প্রতিরোধ ভাঙার জন্য অন্যান্যখানেও এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তারা খেতখামার বা শস্য ধ্বংস করেনি। বরং, ভারতের জোরজবরদস্তিতে মুক্তিবাহিনী পাট বোনার সময় বাধা দিয়েছে। এ সবই ছিল পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য ভারতীয় চক্রান্ত যাতে সাড়ে সাত কোটি লোকের মাঝে তারা বাজার সৃষ্টি করতে পারে।

তারপর শেখ মুজিব ফিরলেন। ভুট্টো তাঁকে বলেছিলেন এবং আশা করছিলেন, পুরনো সম্পর্কের রেশ থাকবে। কিন্তু, বিশাল জনসভায় তিনি পাকিস্তানকে অস্বীকার করলেন— "to the great shock of Bhutto but to great liking of Indira Gandhi."

শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর 'স্বাধীনতা'র নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তারা সবাই শহীদ বীরদের মিছিলে যুক্ত হয়েছেন। "They

have all arched into the procession of the heroes to join the galaxy of the martyrs."

না, এখানেই শেষ নয়। আরেকটি কল্পকাহিনীর অবতারণা করেছেন। বাঙালির মতো দেখতে এক রাজস্থানী সৈন্য তাঁকে জানিয়েছিলো যে, সে নোয়াখালিতে ছয়মাস ছিল। এবং মুক্তিবাহিনী তাদের সাহায্য করেছে বাংলাদেশে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাতে। এ ধরনের কল্পকাহিনী আরো আছে যার মূল বক্তব্য হলো— বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও যে গেরিলা লড়াইটা চলছিলো সেটাও করছিলো ভারতীয়রা।

২৩

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম 'নরক যাত্রা'। ৩১ জানুয়ারি দেখা গেলো, ক্যান্টনমেন্টে তাদের বাসা ঘিরে ফেলেছে ভারতীয় সেনা ও বাংলাদেশ পুলিশরা। তারা জানালো, রাজাকারদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এতে আখতারউদ্দিন ঘাবড়ে গেলেন। তাদের তখন জেনেভা কনভেনশন থেকে শুরু করে অনেক কিছু মনে হলো। আখতারের মনে হয়েছিলো— "But reesoning is not yet superior human behaviour to the superior force, nor is any humanitarian rule a matter of suspect unless it suits the authority concerned."

এ আপ্তবাক্য কি তাঁর মনে হয়েছিলো যখন পাকিরা বাঙালিদের হত্যা করছিলো পাখির মতো ? আখতারউদ্দিনের নাকি নাজি জার্মানির কথা মনে হয়েছিলো। গাড়িতে যাবার সময় বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেলো। আখতার একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, গুলির শব্দ কেন ? অফিসার জানালেন, স্বাধীনতার আনন্দে। কিন্তু, রাজাকারের মনে হয়েছিলো, বিহারি বা পাকিপন্থী সন্দেহে বুঝি কাউকে গুলি করা হচ্ছে। জেলগেটে যখন তাদের আনা হলো, তাঁর মনে হলো, মধ্যযুগের কোনো বন্দিকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে যেন আনা হয়েছে। অথবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি বা জাপানিরা খাঁচায় যেভাবে বন্দি করে রাখতো সেরকম করে রাখা হয়েছে। কিন্তু আখতারউদ্দিন তার আগেই লিখেছেন, তাঁদের জিপে করে আরামেই আনা হয়েছে এবং ভদ্র ব্যবহার করা হয়েছে।

এরপর এসেছে জেলের প্রসঙ্গ যা সব বন্দিই লিখে থাকে। জেল-জীবনের বিবরণের সঙ্গে আখতার উল্লেখ করেছেন, মিরপুরে বিহারিদের ঘরবাড়ি লুট হয়েছে, মেয়েরা ধর্ষিত হয়েছে। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, পাকিরা আত্মসমর্পনের পরও সশস্ত্র বিহারিরা মিরপুর অধিকার করে রেখেছিলো, জহির রায়হানকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করেছিলো। তাদের বিরুদ্ধে যে তখন আরো কঠোর ব্যবহার করা হয়নি এই তো যথেষ্ট !

বাংলাদেশ সরকার তখন, তাঁর ভাষায়, মুক্তিযুদ্ধে কতোজন নিহত হয়েছে তা তদন্ত করেছে। সেখানে দেখা গেলো নিহতের সংখ্যা দু'লক্ষ। ত্রিশলক্ষ কিছুতেই মেলে না ; এর মধ্যে অনেককে আবার মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করেছে। যাক, ত্রিশ হাজার যে আখতারউদ্দিন বলেননি তা-ই যথেষ্ট। তবে তাঁর এই বক্তব্যের মাজেজা হলো— ডিসেম্বরের আগের হত্যা যেমন পশুবৎ তেমনি ১৬ ডিসেম্বরের পরের হত্যাও পশুবৎ।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তাঁর ভাষায়, বিশৃঙ্খল কিছু কয়েদি কলহ করলে মারামারি শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালায়। পাঁচজন নিহত হয়। এজন্য কোনো তদন্ত হয়নি। খবরের কাগজে সংবাদ হয়নি। তাঁর ভাষায়, এখন (১৯৭২) বাংলাদেশের মানুষের জীবন সস্তা। রাজাকারের কিন্তু কখনও মনে হয়নি, দীর্ঘ নয়মাস যখন প্রতিনিয়ত মানুষ হত্যা করা হয়েছে তখন সস্তা দূরে থাকুক মানুষের জীবনের কি আদৌ কোনো মূল্য ছিল ?

২৪

আখতারউদ্দিন জেলের অভ্যন্তরে জীবন যাপনর বর্ণনা দিয়েছেন 'পশু খামার' বা 'অ্যানিমেল ফার্ম' নামক অধ্যায়ে। এটি প্রথাগত একটি অধ্যায়। প্রত্যেক রাজাকারের কাহিনীতে এরকম একটি অধ্যায়ের বর্ণনা আছে যার মূল নির্যাস হলো— জেল নরকতুল্য। কারণ, তাদের নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রাজাকাররা জোট বেঁধে একত্রে থাকতেন, খেতেন, নামাজ পড়তেন, ঘুমাতেন— এসব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আছে।

অংশ্রু প্রু ও অধ্যাপক শামসুল হক ছাড়া বাকি ক্যাবিনেট সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছিলো বা তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারা এরকম একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁরা নির্দোষ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁরা

জেলে। নবি ও তাঁর সাহাবাদেরও তো ধর্মের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং, তারাও করবে।

আখতারউদ্দিন এ ধরনের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বাংলাদেশের বিপক্ষে কটাক্ষ করে গেছেন। এ অধ্যায়ের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে বিহারিদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ। অত্যাচারের কারণেই বিহারিরা মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে জমা হয়। মিরপুরে বিহারিদের নেতৃত্ব দেয় জনৈক আখতার। আখতারউদ্দিন জনৈক আখতার না লিখে লিখতে পারতেন আখতার গুণ্ডা। সে নামেই ব্যক্তিটি পরিচিত ছিল। এবং '৭১ সালে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা সে-ই লাগাতে চেয়েছিলো। কিন্তু 'গুণ্ডা' শব্দটি ব্যবহার করলে আখতার ও তার নেতৃত্বের চরিত্র উন্মোচিত হয়ে যায় এবং মিরপুরের ঘটনাবলী বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। তাই তিনি সে শব্দটি ব্যবহার করেননি। রাজাকারদের রচনায় এ ধরনের কৌশল বা চতুরতা লক্ষণীয়।

আখতারউদ্দিন জানাচ্ছেন, জেলে প্রথমদিকে তাদের অবস্থা খারাপ হলেও আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কারণ, ওয়ার্ডবয়রা তাদের 'ভুল' বুঝতে শুরু করে। জেলজীবন বর্ণনায় প্রতিটি রাজাকারই এ ধরনের কৌশল গ্রহণ করেছে। ওয়ার্ডবয়রা কেন "সহানুভূতিশীল" হয়েছিলো রাজাকারদের প্রতি ? কারণ, পাকিস্তান আমলে তারা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিলো বাংলাদেশ আমলে তা হ্রাস পাচ্ছিলো এবং তারা অনুভব করলো যে রাজাকাররা জনগণের স্বার্থে কথা বলছে। তাঁর ভাষায়—

"So they started having a little sympathy for us till they found out that all that we said or did was in the greater interest of the people and the government was only having a political reprisal by fake devices of detention or trial."

এবং এক পর্যায়ে নাকি তারা এও বলেছিলো, সেপ্টেম্বরে তারা মন্ত্রী হয়ে জনগণের জন্য স্বস্তি এনেছিলো। আর তারা এও জানে যে, ডঃ মালেক গভর্নর হয়ে বাঙালি অফিসার ও ঢাকা-কে রক্ষা করেছেন ভারতীয় বোমা হামলা থেকে।

প্রশ্ন থেকে যায় তা হলে আখতারউদ্দিন কেন নিজেই তাঁর কাহিনী শুরু করেছেন ভারতীয় বোমা হামলা দিয়ে। আর তাঁর বর্ণনায়ই তো আছে 'ঝামেলা' কিছু হচ্ছিলো। অর্থাৎ রাজাকার বা পাকিদের হাতে বাঙালিরা নিহত হচ্ছিলেন। এর সাথে বুদ্ধিজীবী ও চাকুরিরত কর্মকর্তারাও ছিলেন। অর্থাৎ, নিজের বক্তব্যই ওয়ার্ডবয়দের বলে চালিয়েছেন। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় পরবর্তী অনুচ্ছেদে।

ওয়ার্ডবয়রা আরো জানিয়েছিলো, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে বটে কিন্তু ভারত "materially" লাভ করেছে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ তারা নিয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা যা ২৪ বছরে নিতে পারেনি, ভারত কয়েকদিনে তা পাচার করেছে। অর্থাৎ ২৪ বছরে পাকিরা বাংলাদেশ থেকে কিছুই নেয়নি।

আখতারউদ্দিন এসবের উত্তরে বলেছেন—

১. তাদের আটক রাখা হয়েছে এসব সত্য যেন গোপন থাকে

২. তাঁরা যেন বলতে না পারেন, বাংলাদেশ ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে

৩. বাংলাদেশ ভারতের করদরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এই প্রচার পাকিরা '৪৭ থেকে করেছে। '৭১-এর পর রাজাকারপন্থীরা করেছে। সুতরাং, পাকিদের সহযোগী আখতারউদ্দিনও করবেন তা আর অস্বাভাবিক কী ?

আখতারউদ্দিনের সন্তানরা একদিন জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। তারা জিজ্ঞেস করেছিলো, দেশের শাসক কে ? আখতার বলেছিলেন, মুজিব। তখন তাঁর সাত বছরের কন্যা বললো, "তার নাম বলবেন না, তিনি মুসলিম পাকিস্তান হিন্দু ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন শাসক হওয়ার জন্য।"

বলা যেতে পারে, রাজাকাররা ভালো শিক্ষক। না হলে, পিতার এই কঠিন তত্ত্ব সাত বছরের মেয়ে কণ্ঠস্থ করে কীভাবে ? উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে পরাজিত জেনারেল নিয়াজীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়, উপস্থিত মাঝবয়েসী তাঁর দুই কন্যাও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

২৫

গ্রন্থের ১৫ থেকে ২৬ নম্বর অধ্যায় অর্থাৎ পৃঃ ১৪৯ থেকে পৃঃ ৩২০ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে আখতারউদ্দিনের জীবনবৃত্তান্ত যা আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। তাই সংক্ষেপে শুধু তা উল্লেখ করছি বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য।

তাঁর জন্ম বাখরগঞ্জের নবগ্রামে। পিতামাতার ছয় সন্তান, জন্ম তাঁর আনুমানিক ১৯৩০ সালে। ছেলেবেলায় ব্যারিস্টার হতে চেয়েছিলেন। ছাত্র-

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিক লীগের ছাত্র সংগঠনে শাহ আজিজ গ্রুপে। ছাত্রজীবনে তিনি কিছু হিন্দু শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন যাঁরা তাকে উজ্জীবিত করেছিলেন। রাজাকার ও পাকিদের মতে, বাঙালিদের চরিত্র নষ্ট করছিলো হিন্দু শিক্ষকরা। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর ভাষায়ই হিন্দু শিক্ষকরাই তাঁকে উজ্জীবিত করেছেন। তিনি রাজাকার হয়েছেন। তা হলে উপরে বর্ণিত তত্ত্ব খানিকটা গোলমেলে হয়ে যায় না কি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি এম.এ. করেন। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন। এর মধ্যে আইন পাশ করেন। লন্ডন গেলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৯৫৮ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। বিয়ে করলেন খাজা নাজিমউদ্দিনের ভাতিজিকে। মুসলিম লীগ করতেন কিন্তু তারপর যোগ দেন জামায়াতে। জামায়াত থেকে ১৯৬২ সালে নির্বাচিত হন সাংসদ হিসেবে। আইয়ুব তাকে মন্ত্রী করতে চেয়েছিলন। কিন্তু আশ্চর্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী না হয়ে পরে তিনি হানাদার বাহিনীর প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন! ১৯৬৮ সালের দিকে আবার মুসলিম লীগে যোগ দেন।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পাকি গোয়েন্দাপ্রধান রিজভী তাঁকে জানিয়েছিলেন, ২০,০০০ ভারতীয় সেনা ও বেসামরিক ব্যক্তি নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। তারপর তো চলে এলো ১৯৭১। ১৯৭১-এর কাহিনীই এ বইয়ের মূল বিষয় যা আগে বর্ণিত হয়েছে।

জেলের শেষদিনগুলি বর্ণিত হয়েছে ২৭ অধ্যায়ে। এখানে আফশোষ করেছেন তাদের প্রভু পাকি জেনারেলদের বিষয়ে। তাঁর মতে, ভারতীয় জেলে তারা কী করুণ অবস্থায়ই না আছে! তাঁর ভাষায়— "the unfortunate victims, detained in different prison camps in India, were leading a most miserable life as a reward for their patriotism." এই দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা হলেন, নিয়াজী, রাও ফরমান আলি প্রমুখ।

অবশেষে, ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে আরো অনেকের সঙ্গে আখতারউদ্দিন মুক্তি পান। মুক্ত হয়ে ঠিক করলেন যা করেছিলেন তা-ই করবেন। অর্থাৎ রাজাকারদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজাকারি করবেন। আইনব্যবসাও শুরু করলেন এবং একসময় দেখলেন, রাজাকারদের আর নিন্দা করা হচ্ছে না, তাদের শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। তাঁর ভাষায়— "We" collaborators were no longer publicly condemned rather respected."

আখতারউদ্দিন বইটি লিখেছিলেন একটি কারণে। ১৯৭১ সালে তিনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা সঠিক এবং ১৯৭১-এর পরও তা ঠিক। জাতীয়তবাদ

নয় ইসলামই সব সমস্যার সমাধান করবে। তবে, সেই ইসলাম হবে তাদের ব্যাখ্যার ইসলাম যার ভিত্তি পাকিস্তান তত্ত্ব। এখানে বাংলাদেশের কোনো স্থান নেই, বাঙালির কোনো স্থান নেই, স্থান আছে শুধু মুসলমানের। যে কারণে, গ্রন্থের অন্তিমে তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের মুক্তি আসতে পারে একমাত্র পাকিস্তানের সঙ্গে থাকলেই। অর্থাৎ সেই ১৯৪৭-এ ফিরে যাওয়া যা রাজাকারি তত্ত্বের একটি উপাদান।

২৬

মোঃ মিছির উল্লাহ্ পরিচিত কোনো নাম নয়। আখতারউদ্দিন বা আফসার-উদ্দিনের মতো ঢাকা শহরে তিনি বসে রাজনীতি করেননি। পুরো পাকিস্তানও ঘুরে দেখেননি। প্রাক-১৯৪৭-এর অনেক যুবকের মতো পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন, পাকিস্তান লাভ করেছেন এবং নিজ অঞ্চলে থেকে কাজ করেছেন। স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। স্থানীয় এলিট হিসেবে নিজ এলাকায় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু, ১৯৭১ সাল এসেই সব গোলমাল করে দিলো। সে সময় যোগ দিয়েছিলেন শান্তি কমিটিতে। অর্থাৎ এক কথায় পরিণত হয়ে গেলেন রাজাকারে। তাঁর রচনায় তাঁর কর্মকাণ্ডের তেমন ফিরিস্তি নেই বটে কিন্তু পুরো বিবরণটি পড়লে বোঝা যায়, তাঁকে যদি এখনও বলা হয় ১৯৪৭ নাকি ১৯৭১ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য, তা হলে তিনি ১৯৪৭-কেই বেছে নেবেন। অর্থাৎ রাজাকারি চিন্তা ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর এলোমেলো অস্বচ্ছ বিবরণ সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে তা-ই প্রতিভাত হবে।

মোঃ মিছির উল্লাহ্‌র স্মৃতিকাহিনীর নাম 'স্মৃতির প্রেক্ষাপটে'। মৌলভীবাজার থেকে তাঁর পুত্র লিয়াকত আলী ১০০ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশ করেছেন ১৯৮৭ সালে। দাম: পঁচিশ টাকা।

মিছির উল্লাহ ধারাবাহিকভাবে তাঁর জীবনস্মৃতি রচনা করেননি। যখন যা মনে এসেছে লিখেছেন। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান আন্দোলনে কীভাবে সহায়তা করেছেন তার বর্ণনা আছে। জীবনের এই পর্বটি ছিল তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৩ সালে মৌলভীবাজারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪৬ সালে কলকাতা থেকে পাশ করেন মোক্তারি। পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে সে

সময় কয়েকদিন জেল খাটেন। ১৯৪৭ থেকে মৌলভীবাজারে মোক্তারি শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে পাশ করেন অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষা।

মৌলভীবাজারে তিনি নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আজীবন মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন। ১৯৮৭ সালে যখন এই বই বের হয় তখন ছিলেন মৌলভীবাজার মুসলিম লীগের সভাপতি।

লেখক-পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত 'রাজনৈতিক কারণে' জেলে ছিলেন। এই রাজনৈতিক কারণটি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি হানাদার বাহিনী দ্বারা গঠিত শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব খুব সক্রিয় ছিলেন। 'খুব সম্ভব' শব্দ দু'টি উল্লেখ করলাম এ কারণে যে এ বিষয়ে স্মৃতিকাহিনীতে তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে, সক্রিয় না থাকলে হয়ত তিনি গ্রেফতার হতেন না। বই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "নিজের জাতি, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান অল্প এবং অনেকের জ্ঞান সঠিক তথ্য নির্ভরশীল নহে।" তা ছাড়া, "কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট কথাকে বড় করিয়া দেখিয়েছেন এবং বড় বড় ঘটনাকে একেবারে তলাইয়া দিয়াছেন।"

কাজটি অবশ্য তিনিই করেছেন। ঢাকা চিড়িয়াখানা দেখার অভিজ্ঞতা ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার বিষয় একই রকম গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থাৎ দু'টির জন্য যে পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন তার পরিমাণ প্রায় সমান।

২৭

পলাশীর যুদ্ধ দিয়ে মিছির উল্লাহ্র স্মৃতিকাহিনী শুরু। "একদিন স্বাধীন বাঙ্গালী জাতির শত্রু স্বার্থলোলুপ একটি চক্র ক্ষমতার মোহে অর্ন্তদ্বর্ন্দ্বে লিপ্ত হইয়া বিদেশীদের সাথে হাত মিলাইয়া কাশিমবাজার কুঠীতে রচনা করিল স্বাধীনতার সমাধি।" এ তথ্য যে ভুল বলাই বাহুল্য। কারণ, সিরাজ বাঙালি ছিলেন না, বাঙালির সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগও ছিল না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই মন্তব্য করেছেন, "নবাবী আমলে এ দেশের মুসলমানদের শৌর্য্যবীর্য্য ছিল ; ছিল ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু ইংরেজদের আনুকূল্যে একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানীরা মুসলমানদের হাত হইতে সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তাহাদের করিল ভূমিহীন— সর্বহারা।" এ তথ্যও সঠিক নয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদেও বিধৃত হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। "শত শত মুসলমান জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে আত্মবলিদান করিল।" এ তথ্যও ঠিক নয়।

তারপর এসেছে কংগ্রেস প্রসঙ্গ। কংগ্রেসে জিন্নাহ্ যখন বিকশিত হচ্ছেন তখন হিন্দুরা তাঁকে নির্জীব করে ফেলতে চাইলো। তাঁর ভাষায়, "কংগ্রেসের সুচতুর দূরদর্শী কর্মী ও নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ্‌র ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিছনে লেলাইয়া দিল মিস সরোজিনী নাইডুকে। নাইডু ছায়ার মত ঘুরিতে লাগিলেন জিন্নাহ্‌র পিছু পিছু। যে কোন সভাতে জিন্নাহ যে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই মিস নাইডু ত্বরিৎ গতিতে সর্বাগ্রে উহার সমর্থন করিতেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল যে ভাবে পরমাসুন্দরী অরুণাকে দিয়া ভারত বিখ্যাত মেধা সম্পন্ন আসফ আলীর রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করিয়াছিল সে ভাবেই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও ধ্বংস করিবে কিন্তু বিধাতার কৃপায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনন্য সাধারণ প্রতিভা এবং নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্রের বলে কুচক্রীরা তাঁহাকে বিপথগামী করিতে ব্যর্থ হইল।"

এই গূঢ় তথ্য প্রথম জানা গেলো মৌলভীবাজারের মিছির উল্লাহর কাছ থেকে।

তা যাহোক কংগ্রেস তো চক্রান্ত চালাচ্ছেই। অনেক মুসলমানও "শো বয়" হিসেবে কংগ্রেসের কাজ করেছে। তারপর এলো ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। দিবসটি ঘোষণা করলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী আর "এই দিন কলিকাতায় হিন্দুদের প্ররোচনায় এক ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।" সোহ্‌রাওয়ার্দী সেই দাঙ্গা থামাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "কিন্তু কই ? সে রক্তলোলুপ উগ্রবর্ণবাদী দল কিছুতেই মুসলমানের রক্তপাত বন্ধ করিল না। ক্রমেই এই দাঙ্গা নোয়াখালী, বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল।"

তারপর উপমহাদেশ বিভক্ত হলো। এখানে এ সম্পর্কে সাড়ে চার লাইনের যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে হুবহু মিল আছে পূর্বোক্ত রাজাকারদের চিন্তাধারার। লিখেছেন তিনি "এদিকে চাণক্য পণ্ডিতের বংশধর উগ্রবর্ণবাদীরা কূটনৈতিক চালে জওহরলাল নেহরুর অন্তরঙ্গ বন্ধু তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ইংরেজের আনুকূল্য লাভের আশায় ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিল— আর কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ স্বয়ং পাকিস্তানের প্রথম বড়লাট হইলেন।" কিন্তু, এখানেই শেষ নয়। ঘুষের বিনিময়ে অনেক অঞ্চল "ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হলো। "চাণক্য পণ্ডিতের বংশধরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে নিয়া গেল আমাদের হাইলাকান্দি, গোয়ালপাড়া, করিমগঞ্জের একাংশ, পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে পূর্ব পাঞ্জাব ও কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ।"

এই যুক্তি পাকি নীতিনির্ধারকদের মতো প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর বা তাদের মতে, ১৯৪৭ সালের পর ভারত কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি দখল করে নিলো "কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর মিত্র প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ টু শব্দটি পর্যন্ত করিল না। চাহিয়া দেখুন গোয়া, দমন, দিউ, পন্ডিচেরী এবং বর্তমান কালের সিকিমের দিকে। কি অদ্ভুত চাণক্য নীতিতেই না তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল।"

এ ধরনের মন্তব্যের ভিত্তি যতোটা না যুক্তি তার চেয়ে বেশি পূর্বধারণা। এই ধরনের পূর্বধারণার বিপরীতে যুক্তি বা বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই।

মিছির উল্লাহ এরপর বর্ণনা করেছেন ঢাকা চিড়িয়াখানা ও সংসদ ভ্রমনের কাহিনী। বর্ণনাটি সাধারণ কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু মন্তব্য প্রমাণ করে ১৯৭১-এ পরাজিত হলেও তারা সমর্থক '৭১-পরবর্তী সেসব রাজনীতিবিদের যারা রাজাকারি চিন্তা আবার প্রোথিত করতে চেয়েছেন বা চাচ্ছেন।

প্রথমে মিরপুর চিড়িয়াখানা যার অব্যবস্থা তাকে ব্যথিত করেছে। এর সঙ্গে তুলনা করেছেন লন্ডনের চিড়িয়াখানার। সেখানে হিংস্র জন্তুগুলিও কতো নমনীয়। "তাদের এহেন অবস্থা দৃষ্টে মনে হইল যেন ইংল্যান্ডেশ্বরীর মোহনীয় চেহারার আকর্ষণে তাদের হিংসানল প্রশমিত হইয়া গিয়াছে।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ঢাকায় সংসদ ভবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রথমে তাঁর প্রবল বাসনা হলো মরহুম জিয়ার কবর জেয়ারত করার। "তাহার কবরের পূর্বপ্রান্তে অনেকের লিখা অনেকের কবিতার অংশ বিশেষ পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম যে জনগণের জন্য কিছু করিলে জনগণ তাহা ভুলে না, যথাযথ মর্য্যাদা দেয়।"

সংসদ ভবনের বৃত্তান্ত সম্পর্কে তিনি জানতে পারলেন, "ভবনটি আয়ুব খান তৈরী করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কোন নেতাই কিছু করেন নাই। অবশেষে মরহুম জিয়াউর রহমান ভবনটি চালু করিবার নিমিত্ত ১২ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

আপাতদৃষ্টিতে সত্য বর্ণনা। ঠিকই তো আইয়ুব খান-এর সময় এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়, জিয়াউর রহমান এরপর এর কাজ শুরু করেন যার অর্থ দাঁড়ায়— এ দু'জনেরই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত সত্যিকার সংসদীয় সরকার কয়দিনের ছিল আর সামরিক সরকার কয়দিনের ছিল ? অখণ্ড পাকিস্তান আমলে এটার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়নি বা সংসদের অধিবেশন এখানে হতোও না। স্বাধীনতার পর অবকাঠামো নির্মাণ কতোটা গুরুত্বপুর্ণ ছিল আর সংসদ ভবনের সংস্কার কতোটা প্রয়োজনীয় ছিল

তা স্বাভাবিকভাবেই তিনি বুঝতে চাননি। কিন্তু ঐ দুটি বাক্যের মধ্যে বাকি সব ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গেছে।

এরপর তিনি সবুর খান ও তমিজউদ্দিন খানের রুহের মাগফেরাত কামনা করলেন। সবুর খানের "কবরটি বাঁশের বেড়ার আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। দুই পার্শ্বে দুইটা নামফলক আহ্বান করিতেছে জনসাধারণকে "আস, দেখ মুসলীম লীগের তথা নিপীড়িত নির্যাতিত বাংলার মুসলমানদের নির্ভীক সৈনিক বাঙ্গালী জাতির এহেন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কিভাবে চোখ বুজিয়া মুখ বন্ধ করিয়া চিরশান্তিতে শুইয়া আছেন।"

অর্থাৎ ১৯৭১-পরবর্তী সময়টি দুর্যোগপূর্ণ যেহেতু পাকিস্তান নেই। এবং সবুর খান হতে পারতেন বাঙালির ত্রাণকর্তা।

২৮

ঢাকা ভ্রমণের বর্ণনার পর আবার এসেছে আইয়ুব খানের প্রসঙ্গ। পাকিস্তানের শাসকদের মধ্যে আইয়ুব খান রাজাকারদের কাছে বিশেষ প্রিয়।

মিছির উল্লাহ্ও এর ব্যতিক্রম নন। আইয়ুব খান তাঁর প্রিয়। কারণ, "আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বদৌলতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপিত হওয়ায় দেশের উন্নয়নমূলক কাজ সম্ভবপর হইয়াছিল। দেশের এহেন উন্নতিতে আমাদের অবন্ধুর দল হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়াই নির্লজ্জভাবে ১৯৬৫ সনে ৬ই সেপ্টেম্বরে অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করিল পাকিস্তান।... যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চাণক্য পণ্ডিতের বংশধরেরা কুটনৈতিক কৌশল আঁটিতে লাগিল এবং পাকিস্তানকে খতম করার জন্য দল বদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।"

ইতিহাস রচনার সময় মনের মাধুরী মেশালে কী অবান্তর ঘটনার সৃষ্টি করা যায় তার নিদর্শন মিছির উল্লাহ্র পরবর্তী অনুচ্ছেদ।

৬ দফার দাবীতে দেশে আরম্ভ হইল ভীষণ আন্দোলন, ঐ আন্দোলনে ইসলামের পরিপন্থী দলগুলির সহিত যোগদান করিল জামায়াতে ইসলাম। এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে। শেখ মুজিবুর রহমানকে কারামুক্ত করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে না দিলে জামায়াতে ইসলাম বৈঠকে যোগদান না করার গোঁ ধরিলে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আক্ষেপ করিয়া উক্তি করিলেন "কিসের জন্য এত সংগ্রাম,

ইসলামের মুখপত্র জামায়াতে ইসলামী যখন সরাসরি ভাবে ইসলামের দোষমনদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করিল যখন আমার গদিতে থাকা সমীচীন নহে.... ।"

মুসলিম লীগ (কনভেনশন) তখন ক্ষমতায়। সে কারণে, মুসলিম লীগ ছিল 'ইসলামের রক্ষক'। আবার ১৯৭১ সালে জামায়াত বাংলাদেশের বিরোধিতা করলে মুসলিম লীগের সঙ্গে তারাও হয়ে দাঁড়ায় 'ইসলামের রক্ষক'।

নির্বাচনের বিষয়ে পাকি নীতিনির্ধারক, জেনারেল ও রাজাকারদের চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন। এক্ষেত্রে আবার বড় রাজাকার ও ছোট রাজাকারে কোনো পার্থক্য নেই। আগের অধ্যায়গুলিতে দেখিয়েছি মতিউর বা আখতারউদ্দিন ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন। মিছিরউল্লাহ্ও তা মনে করেন-"সীমান্তের অপর পার হইতে অগণিত অবন্ধুর দল আসিয়া কর্মতৎপর হইল, অস্বাভাবিকভাবে দারুণ কারচুপির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান জয়লাভ করিলেন। সে সময় হইতে দেশের নির্বাচনে জন্ম নিল কারচুপি।"

এর পেরের বাক্যগুলিতে আবার উল্টোকথা বলছেন মিছির উল্লাহ। ভুট্টো ক্ষমতা ছাড়তে রাজি নয়। "কিন্তু তাহারা মেহেদী পাতার সবুজ রং দেখিয়া ভিতরের রক্তের আল্পনা বুঝিতে পারে নাই। ফলে তিরানব্বই হাজার অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত সেনাদল এই দুর্বল বাঙ্গালী জাতির নিকট পরাজিত হইল। পাকিস্তানী সৈন্যরা বন্দী হইল। বুঝিতে পারিল বাঙ্গালী জাতির তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শৌর্য্য বীর্যের তেজ।"

এই অনুচ্ছেদটি যদি পরের অনুচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারবো কেন হঠাৎ এ কটি লাইনে বিবরণে চলে এলো। এর কারণ, এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। সুতরাং, এক্ষেত্রে মনের মাধুরী মেশালে বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য হবে না। পরের অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা লাভ, শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের কথা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় শেখ মুজিবের কারণে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো তার কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর নামের আগে কোনো বিশেষণ নেই। তবে, সপরিবারে তাঁকে হত্যার কথা আছে। কিন্তু জিয়াউর রহমানের নামের আগে বিশেষণ তো আছেই, তাঁর "অবদান"-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এরই মধ্যে, ভারতই যে এসবের জন্য দায়ী তা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। এভাবেই আমরা লক্ষ করি কী সূক্ষ্মভাবে 'টেক্সট' বদলে যায় এবং নিজের চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই অনুচ্ছেদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"১৯৭১ ইংরেজীর ১৩ই ডিসেম্বর বাঙ্গালী জাতি নিরঙ্কুশ ভাবে জয়লাভ করিল। বাঙ্গালী জাতি যখন পৃথিবীর বুকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এমন সময় ১৯৭৫ ইংরাজীর ১৫ই আগষ্ট গভীর রাতে এদেশের কতিপয় সশস্ত্র লোক [সেনাবাহিনী নয়] শেখ মুজিবকে তাহার নিজ বাসভবনে সপরিবারে হত্যা করিল। তারপর আরম্ভ হইল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র [অর্থাৎ ভারতীয় ষড়যন্ত্র]। বিষধর সর্প পুনরায় [অর্থাৎ ভারত] ছোবল হানিল বাঙালী জাতির উপর তাহাদের দোসর খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে [তাঁকে সব সময় ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে জিয়াপন্থীরা]। কিন্তু জনসাধারণ এবং খাঁটি দেশ প্রেমিক সৈন্যের [সেনাবাহিনী সবসময় দেশপ্রেমিক। পাকিরা যেমন বলে, উপরে আল্লাহ, নিচে মিলিটারি] মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইল তাহাদের অভ্যুত্থান। এই সংকট মুহূর্তে ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ জিয়াউর রহমান বাঙালীর ভাগ্য নিয়ন্তা হইয়া বাঙালী জাতিকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পদব্রজে ছুটাছুটি করিয়া জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকেও" প্রাণ দিতে হলো।

বঙ্গবন্ধু "মহাপ্রাণ" ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুও "দুর্ভাগ্যজনক" ছিল না। শুধু তাই নয়, জিয়াউর রহমান তুলিত হলেন সিরাজউদদৌলার সঙ্গে। জিয়া "পদব্রজে ছুটাছুটি করিয়া জনগণের দুঃখ দুর্দশা" লাঘব করতেন। আর সিরাজও "বাঙালী জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য স্বাধীন নবাব আরাম আয়েশ ত্যাগ করিয়া জনগণের শান্তির জন্য বর্গীর পিছনে দৌড়ান।"

এ প্রসঙ্গে আবার দুই লাইনে রাজাকার সাঈদীর প্রশংসা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবারও ভারতকে দোষারোপ করে বলা হয়েছে— "বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি নিয়া বর্ণবাদী চাণক্য পণ্ডিতের বংশধর পুনরায় চক্রান্তে লিপ্ত। আজ আমাদের আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম, তিনবিঘা, বেরুবাড়ীর অবস্থা কি ? কেন আমাদের দ্বীপ তালপট্টির উপর হিন্দুস্থানী পতাকা পত্ পত্ করিতেছে ? আজ ফারাক্কা বাঁধ আমাদের মরণফাঁদ।"

২৯

পৃষ্ঠা ২৫ থেকে ৭১ পর্যন্ত সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। তাঁরা কীভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করলেন সে

সম্পর্কেও কিছু তথ্য আছে। এ বিবরণ আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু, লক্ষণীয় এর মধ্যেও সুযোগ পেলেই ভারতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যা তার আলোচনার জন্য ছিল অপ্রাসঙ্গিক। তবে, উদাহরণস্বরূপ দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

১. "চাণৈক্য পণ্ডিতের বংশধর আমাদের ওসমানীকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আত্মসমর্পণের দলিল সৃষ্টির পিছনে ঘোর রহস্য বিজড়িত রহিয়াছে।"

২. "১৯৬৫ সলে পাক ভারত যুদ্ধে যে জাতি এক ঝান্ডার তলে সমবেত হইয়া ভারতকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিল, চাণৈক্য নীতিতে সে ভারত আমাদের জাতির ভবিষ্যত যুবক ও বুদ্ধিজীবীকে বিভ্রান্ত করিয়া ১৯৭১ সনে সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল, আমরা নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছি বটে তবে ভারতের করাল ছোবল ও আধিপত্যবাদের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া আমাদের ত্রাহিত্রাহি অবস্থা।"

অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা উচিত ভারতের প্রশংসাসূচক তিনটি বাক্য আছে পুরো বইটিতে।

"দেখুন আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের দিকে কতনা কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া তাহারা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত বিলাসীতা কিংবা বিদেশী দ্রব্য তাহাদের জন্য হারাম।" কিন্তু পরমুহূর্তেই লিখেছেন "আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার নিমিত্ত বর্ণবাদীরা ভারত বিভাগের পর হইতে আদাজল খাইয়া আমাদের সাথে লাগিয়া আছে। কোন সরকারই সীমান্ত পাচার বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়াও কৃতকার্য্য হইতেছে না।"

সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ দেয়ার সময় হঠাৎ-হঠাৎ মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। আমি প্রথমে দু'টি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যাতে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গ কী ?

১. "সংগ্রামের সময় ভারতীয় দালাল কিছু সংখ্যক বিকৃত মস্তিষ্কধারী যুবক শহীদের জ্যেষ্ঠপুত্র সহ বেকসুর গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহা হত্যা নয় সত্যিকারের শাহাদাৎ লাভ।"

২. "ভারত হইতে আগত আমাদের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক ভারতের নীল নক্সানুযায়ী এ দেশের মেধাবী বীর মুজাহিদদের ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিল।"

৭২ পৃষ্ঠায় এসে ১৯৭১ সালের মার্চের কথা। "১৯৭১ সনের সংগ্রামের ভয়াল অবস্থা এবং আমাদের মুসলীম লীগারদের ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা মানসপটে উদয় হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে।" সে সময় তিনি মৌলভীবাজার ছেড়ে চলে যান। "তৎপর পাকিস্তানী সৈন্য মৌলভীবাজার শহরের দিকে

অভিযান চালাইলে মুক্তিরা তাহাদের বিপদ ভাবিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তাছাড়া প্রাণের ভয়ে পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নিয়া সংগ্রাম চালাইতে থাকে।"

তখন তিনি মৌলভীবাজারে ফিরে আসেন এবং "ঢাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের উদ্দেশ্যে" তিনি মহকুমা শান্তি কমিটির কনভেনার বা আহ্বায়কের পদ গ্রহণ করেন। শান্তি কমিটির প্রত্যেকেই "দেশরক্ষা"র জন্য কমিটিতে যোগ দিয়েছিলো। মিছির উল্লাহ শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় তার মন কোন দিকে। সেটি একেবারে খাঁটি রাজাকারের মন। তিনি লিখেছেন—

১."পাকিস্তানী সৈন্য দেশের শাসনভার পুনরুদ্ধার ক্রমে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করার নিমিত্ত স্থানে স্থানে শন্তি কমিটি (Peace committee) গঠন করতঃ সংগ্রামী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে। সরকারী সম্পত্তি বিশেষ করিয়া পুলগুলি পাহারা দেওয়ার নিমিত্ত রাজাকার বাহিনী গঠন করে। তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া শান্তি কমিটির অধীনে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়। তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য কর্ম করিতে থাকে। দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে অনেকে আবার কর্তব্যরতাবস্থায় প্রাণ হারাইয়াছে। তাহাদের পরিবারের জন্য অনেক দুঃখ হয়। তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।"

১৯৭১ সালে পাকিদের প্রচারযন্ত্রে সবসময় "দুস্কৃতকারী" শব্দটির উল্লেখ থাকতো যার অর্থ মুক্তিযোদ্ধা। মিছির উল্লাহর দুঃখ হয় রাজাকারদের পরিবারের জন্য। তাদের আত্মার মাগফেরাত তিনি কামনা করেন। কিন্তু, পুরো বইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এরকম কোন দুঃখবোধ লক্ষ করা যায় না। আত্মার মাগফেরাত তো দূরের কথা।

২. "রাজাকার বাহিনীর পাশাপাশি জামাতে ইসলাম তাদের নিজস্ব লোক নিয়া আলবদর এবং আলসামছ বাহিনী গঠন করতঃ তাহাদের ইচ্ছানুসারে কাজ চালাইতে থাকে ফলে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘণ করার ফলে রাজাকার বাহিনী দুর্ণামগ্রস্থ হইয়া যায় কিন্তু আসলে তাহারা দুর্ণামের কোন কাজ করে নাই এবং তারা কোন সুযোগও পায় নাই।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শান্তি কমিটির হয়ে তিনি কী করেছেন তারপর তার ফিরিস্তি দিয়েছেন। যেমন,

১."আওয়ামী লীগ কর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু লোককে ডান্ডি কার্ড অর্থাৎ আইডেন্টিটি কার্ড দিয়া নির্বিঘ্নে চলাফেরার সুযোগ দিয়াছি।"

২." অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে গুলি হইতে বাঁচাইয়াছি।"

৩. "নিরাশ্রয় লোকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি।" ইত্যাদি।

শান্তি কমিটি এতো ভাল ভাল কাজ করলে মানুষের আর রাজাকারদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকতো না।

৪ঠা ডিসেম্বর মিছিরউল্লাহ মৌলভীবাজার ত্যাগ করেন। তারপর জুন পর্যন্ত বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাসায় পালিয়ে থাকেন। কোথায় কোথায় পালিয়ে ছিলেন তার বিবরণ আছে। জুন মাসে যখন মামাশ্বশুরের বাসায় পালিয়ে আছেন তখন তার ভাবান্তর হয়। বাজারের মহাজনরা মামাশ্বশুরের বাসায় আলাপ আলোচনার জন্য আসতো। আর মিছিরউল্লাহ লুকিয়ে তাদের আলোচনা শুনতেন। "তাহারা বলিত জেলের মধ্যে হাজার হাজার কয়েদী তাহাদের জিকিরে আল্লার আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। আমি যতই তাহাদের কথা শুনিতে থাকি ততই আমার মন আকৃষ্ট হইতে থাকে। আমি ভাবিতে থাকি আমার সহকর্মীরা জেলের ভিতর আর আমি আত্মগোপন করিয়া আরাম আয়াসে দিন গুজরান করিতেছি। জেলত চিরস্থায়ী নহে। তাহারাও একদিন বাহির হইবে। আমার সহিত দেখা হইলে কি ভাবে আমি তাহাদিগকে মুখ দেখাইব ?"

সুতরাং, তার মনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। জুন, ১৯৭২ সালে তিনি ধরা দিলেন।

সেখানে তাঁর বন্ধু রাজাকারদের সঙ্গে দেখা হলো [মৌলভীবাজারের রাজাকারদের নামের তালিকা পাওয়া যাবে] "মৌলভীবাজার জেলে কয়েক মাস থাকার পর দালালী মোকদ্দমা হইলে জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া আরও কয়েক বৎসর কোর্টে দালালী মোকদ্দমা চালাইয়া বেকসুর খালাস পাই।"

বই শেষ করেছেন এ মন্তব্য করে "বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের সম্মুখে কোন দর্শন নাই। একেক দল একেক দর্শন নিয়া মাঠে বিচরণ করিতেছে কিন্তু কোন দলই দেশকে সঠিক পথে চালাইবার সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন দর্শন জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ফলে দেশে অশান্তি এবং নৈরাজ্য বিদ্যমান।"

৩০

প্রথম খণ্ডে আটজন এবং দ্বিতীয় খণ্ডে চারজন মোট বারোজন রাজাকারের আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে যাদের

আত্মজীবনী আলোচিত হয়েছে তাঁরা হলেন— ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, হামিদুল হক চৌধুরী, এ. কে. এম. এ. খালেক মজুমদার, মুহাম্মদ আয়েনউদ্দিন, কে. এস. আমিনুল হক, সা'দ আহমেদ, আব্বাস আলী খান এবং ডাঃ আবদুল বাসেত। দ্বিতীয় বা বর্তমান খণ্ডে আলোচিত হলো মেজর (অব) আফসারউদ্দিন, আখতারউদ্দিন, মোঃ মিছিরউল্লাহ এবং এক অজানা লেখকের। শেষোক্ত বইটি সম্পাদনা করেছেন মতিউর রহমান। ধরা যেতে পারে বইটি তিনিই লিখেছেন।

এই এক ডজন রাজাকারের মধ্যে নয় জনই উচ্চশিক্ষিত, পেশাজীবী। সাজ্জাদ হোসায়েন, আব্বাস আলী খান ও মতিউর রহমান যুক্ত ছিলেন শিক্ষকতার সঙ্গে ; আয়েনউদ্দিন, হামিদুল হক চৌধুরী, সাদ আহমদ ও আখতারউদ্দিন ছিলেন আইনজীবী। আব্দুল বাসেত ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক। তবে সাজ্জাদ হোসায়েন, আবদুল বাসেত ও মতিউর রহমান ছাড়া বাকি সবাই যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে এবং অধিকাংশ ছিলেন জামায়াত সমর্থক। এঁদের অধিকাংশের কর্মস্থল ছিল ঢাকা শহর। এদের মধ্যে ডিগ্রীর ঔজ্জ্বল্য নেই, আফসার উদ্দিন, খালেক মজুমদার, আমিনুল হক এবং মিছিরউল্লাহ্‌র।

প্রথমোক্তরা শহুরে এলিট, দ্বিতীয়োক্তদের মধ্যে মিছিরউল্লাহ্ এবং আমিনুল হক গ্রামীণ এলিট। এবং এদের রচনারীতিতে পার্থক্য আছে। যারা উচ্চতর ডিগ্রীর অধিকারী স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বর্ণনা ধারাবাহিক এবং রচনারীতিতে একটি পদ্ধতি তাঁরা অনুসরণ করেছেন। অন্যদের রচনারীতি দেখলে স্বাভাবিকভাবেই এ পার্থক্য চোখে পড়ে। দ্বিতীয়োক্তদের রচনায় পদ্ধতির অভাব। তাই এলোমেলো। অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে চিন্তা তাদের চিন্তা বা অবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনফিউজড। কিন্তু তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে সরাসরিভাবে। প্রথমোক্তদের রচনারীতিতে কৌশল আছে, নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা আছে এবং তাঁদের ভূমিকাকে তাঁরা একটি যৌক্তিক ভিত্তি দিতে চেয়েছেন। শেষোক্তরা সে কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেননি। এর উদাহরণ আমিনুল হক যার বইয়ের নাম- আমি আলবদর বলছি।'

গ্রামীণ বা মফস্বলের এলিটদের রচনারীতির সঙ্গে মিল আছে মফস্বলের রাজাকারদের ভাষার। যেমন, যশোর শান্তি কমিটির সম্পাদক আমজাদ হোসেন জানিয়েছেন– যশোর টাউন হল ময়দানে জেলার ২১ জন বীর রাজাকারের আত্মগ্যাগের জন্য তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হবে।" বা জামালপুর জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রচারিত লিফলেটে বলা হয়েছে "পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা পূর্বক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানবাদী নাগরিক হিসাবে অংশগ্রহণ করুন।"

সরাসরি বক্তব্য। রাজাকারদের মূল নির্যাস ব্যক্ত করেছেন তারা কোনো কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে। আসলে, শহুরে শিক্ষিত এলিট বা মফস্বলের কম-শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে চিন্তাভাবনা বা লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু মূল বিষয় একটিই। তা হলো—ভারত পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করতে চাচ্ছে। এতে শুধু পাকিস্তান নয় ইসলামও বিপন্ন। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা "জাতীয় ও ধর্মীয়" কর্তব্য।

মুক্তিযুদ্ধের পর রাজাকাররা পুনর্বাসিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের পর। এদের অনেকে তখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। অনেকে আবার দল পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। কিন্তু, কোনো পক্ষই ১৯৭১ সালে নিজেদের ভূমিকার জন্য অনুতপ্ত হননি। আওয়ামী লীগের বিরোধী শক্তি বা যারা তাদের পুনর্বাসিত করেছেন তাদের আশ্রয়ে তারা থাকতে চেয়েছেন। যে কারণে, যারা জামায়াত করেননি তারা জিয়াউর রহমানের রাজনীতির সাথে নিজেদের আবিষ্কার করেছেন, একাত্মতা বোধ করেছেন। অর্থাৎ, তাদের আদর্শ যারা পুনর্বাসিত করবে তাদের সমর্থন যুগিয়েছেন। জিয়াউর রহমান এভাবেই তাঁর আসন পাকাপোক্ত করতে চেয়েছেন। এ ধারা এখনও অক্ষুণ্ন।

৩১

রাজাকারদের কেউ শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন, কেউবা রাজাকার, আল-শামস বা আল-বদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাত্রার ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু সবাই একযোগে পাকি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। এবং প্রায় প্রত্যেকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হত্যা, লুঠ, ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ ত্রিশ বছর পর হয়ত আমরা অনেকে ভুলে গেছি তারা কী করেছিলেন। কিন্তু, পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে বোঝা যাবে ন'টি মাস কী অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে তারা সমগ্র বাংলাদেশে।

পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, ইউনিয়ন পর্যন্ত শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। ফলে, ঢাকা শহর থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। ফলে, ঢাকা শহর থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল। তাদের প্রধান কাজ ছিল, নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে মুক্তিপণ আদায়, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধর্মান্তকরণ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি

দখল। এক কথায় যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কাজ। আমি সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. হিন্দু নামাঙ্কিত রাস্তাঘাট বা প্রতিষ্ঠানের নাম বদল। খুলনা শান্তি কমিটির ৫৩ জন সদস্যের এক সভা ডাকা হয়েছিলো ১ আগস্ট। জামায়াতের এ. কে. এম. ইউসুফ ছিলেন সভার প্রধান ব্যক্তি। সভাটি ডাকা হয়েছিলো হিন্দু নাম বদলের জন্য—

"An emergent meeting of the members of the central Peace Committee will be held on 1st August 71 at 4 p.m. to disscuss about changing the nominclature of the records having Hindu names."

২. হিন্দুদের ঘরবাড়ি দখল। যদিও তারা ঘোষণা করেছিলো পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি কেউ দখল করবে না বরং রক্ষা করবে। সম্পত্তি দখলের জন্য তারা কিছু কৌশল গ্রহণ করেছিলো।

যশোর শান্তি কমিটির সভাপতি কমরউদ্দিন ২৮ জুন (১৯৭১) যশোরের ডিসির কাছে এক আবেদন করেন। আবেদনপত্রে তিনি জানান মিস্ত্রিখানা রোডে তাঁর বাড়িটি ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তার কোন বাড়িঘর নেই সুতরাং তাঁকে একটি "হিন্দু বাড়ি" বরাদ্দ করা হোক।

যশোরের মুজিবুর রহমান মৃধা "আটাচাকি" স্থাপন করতে চান সেজন্য বাসা দরকার। সেজন্য তিনি আটার কল স্থাপনের অনুমতি ও বাসা চান। কারণ "I am a Muhajir hailing from India having no other source of income and this favour if shown will open to me an avenue for earning my livlihood." (২১.৭.৭১)

বলা বাহুল্য, তাদের কোনো আবেদন নাকচ করা হয়নি।

৩. ধর্মান্তকরণ। রাজাকাররা 'সওয়াব'-এর আশায় জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করেছে। স্বেচ্ছায় কেউ ধর্মান্তরিত হতে চায়নি। ধর্মান্তরিত না হলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে, স্বরোচিত সরকার সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, বাগেরহাটের মাদুর পাল্টা ও সাহেবের মেঠ গ্রামে "প্রায় সাত-আটশো লোককে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলমান করা হয় এবং গরু জবাই করে মেজবানি বা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করার জন্য নওমুসলিমদের বাধ্য করা হয়। শুধু প্রীতিভোজের মধ্যেই তাদের ফতোয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। পিস কমিটির ইচ্ছানুযায়ী বিবাহযোগ্য নওমুসলিম কন্যাদের একটি অংশ পিস কমিটির নেতার অনুগত যুবকদের বাড়িতে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়।"

এ তো গেলো মাত্র দু'টি গ্রামের হিসাব। এরকম অজস্র ঘটনা তখন ঘটেছে।

৪. ধর্ষণ। প্রায় বলা হয় পাকি বা রাজাকাররা ধর্ষণ করেনি বা করলেও সামান্য। আমি মাত্র নোয়াখালি জেলার কিছু কাগজপত্র দেখেছি। সেখানে প্রতিটি ইউনিয়নে ধর্ষিতাদের নাম ও সংখ্যা দেয়া হয়েছে। সে বিবরণ দেখলে গা শিউরে উঠবে। একমাত্র কালিদহ ইউনিয়নে রাজাকার কমান্ডার নুর আলীর সহায়তায় ৪০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। সোনাগাজি ইউনিয়নে ধর্ষিত হন ১৫০ জন। পুরো বাংলাদেশে তা হলে হিসেব করে দেখুন কতো নারী ধর্ষিত হয়েছেন। তবে, মনে রাখা দরকার অনেক ধর্ষিতা নারীর হিসাব স্বাভাবিক কারণে পাওয়া যায়নি।

৫. অগ্নিসংযোগ। গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ ছিল নিত্তনৈমত্তিক ঘটনা। সারা বাংলাদেশে কী পরিমাণ ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিলো তার সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

নোয়াখালির আমিরাবাদ ইউনিয়নে ১৫০৩টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩৪৪টি পরিবার। সোনাগাজি ইউনিয়নের যেসব গ্রামের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছি— তার বিবরণ—

১. সুজাপুর	৫০০
২. ছাদিকান্দি	৩০০
৩. চরগণেশ	২০০
৪. তুনাতুলি	৫০০
৫. চর খোয়াজ	২০০
৬. চর খোন্দকার	৫০০

৬. হত্যা ও দৈহিক নির্যাতন। রাজাকাররা প্রায় প্রতিটি গ্রামে কিছু-না-কিছু হত্যা করে। নির্যাতিতের সঠিক সংখ্যা জানা অবশ্য মুশকিল। তবুও তৃণমূল পর্যায়ে দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি এর মাত্রা বোঝাবার জন্য।

নোয়াখালির আমিরাবাদ ইউনিয়নে নির্যাতন চালানো হয় ২৯ জনের ওপর, হত্যা করা হয় ৩০ জনকে। সোনাগাজি ইউনিয়নে নির্যাতন চানানো হয় ১২৫০ জনের ওপর আর হত্যা করা হয় ২৪০ জনকে।

৭. শান্তি কমিটির মূল কাজ ছিল দেশ 'রক্ষা'। এ কারণে 'দুষ্কৃতকারী' (অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ)-দের প্রতিরোধ করার জন্য পাকিবাহিনীকে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। যশোর শান্তি কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো—

"This meeting requested all the members of these committee to be report for maintaining peace and order in their localities and to be at guard for the defence of the country from the miscreants and to help our armed forces at all times as and when required." (২৭.৮.৭১)

পাকিদের সাহায্য করতে যেয়ে যেসব লোক মারা গেছে বা মারাযাবে তাদের সাহায্যের জন্য গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন শান্তিকমিটি অর্থ-সাহায্যের বন্দোবস্ত করেছিলো। সামরিক কর্তৃপক্ষ এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৫.৯.৭১ তারিখে একটি নির্দেশ জারি করেছিল। সে আদেশের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

"The Martial Law Authority has been plesed to award of Distress Grant to the families of several categoriesof individuals as well as to the deserving members of the public killed for their pro-Pakistani leanings."

এর পরও যখন জামায়াতের নতৃবৃন্দ, বা রাজাকাররা বা বাংলাদেশের পাকিরা দাবি করে ১৯৭১ সালে তারা পাকিদের সহযোগী ছিল না বা ১৯৭১ সালে তেমন কিছু ঘটেনি তখন আপনি কী বলবেন?

৩৩

রাজাকারের মন কেমন বা কীভাবে সে চিন্তা বা কাজ করে তা পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। সে আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা যেতে পারে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিলো পাকিস্তানের। বাঙালি মুসলমান তাতে পালন করেছিলো অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু পঞ্চাশের দশকেই আবার বাঙালি মুসলমানের প্রগতিবাদী অংশ এই তত্ত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

এর বিপরীতে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সমর্থন করা দলগুলো। নতুন ভূখণ্ডে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তারা। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ দখল করে বিত্তবানও হয়েছিল তারা।

ফলে নব্যএলিটদের মধ্যে তাদের একটা ভিত্তি তৈরি হয়। ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার জন্য একটি 'আদর্শ'-এর প্রয়োজন হয়। কারণ, সাধারণ মানুষকে তো বলা যায় না যে, আমি লুট করার জন্য ক্ষমতায় যেতে চাই। মুসলিম লীগ ও সমমনাদের সেই আদর্শ ছিল। সেটি হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং ক্ষমতা যতই পাকাপোক্ত হতে লাগলো ততই এর সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলো নানাবিধ উপাদান।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গণতন্ত্রের একটা ভাব ছিল। আমলা শাসন তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে শাসকদের তত্ত্ব জোর করে চাপানো সম্ভব হয়নি। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও ততটা জোরদার হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পরে পটভূমিকা সম্পূর্ণ বদলে গেল। দ্বিজাতিতত্ত্ব রইলো, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হলো ভারতবিরোধী প্রচারণা। সেই তত্ত্বেরই অন্য রূপ। এর অর্থ পাকিস্তান = মুসলমান, হিন্দু = ভারত যদিও পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হলো নেপাল। অন্যদিকে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একাংশের লোভ—সবকিছু মিলে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ করে দিলো। সেই কারণেই আমলাতন্ত্র ও ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যে কমবেশি আঁতাত থাকে। এদের মাধ্যমেই আদর্শের মডেল ছড়িয়ে দেয়া হতে লাগলো প্রচারমাধ্যম, পাঠ্যবই এবং সংস্কৃতিতে। সামরিক বাহিনীর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাকুল কালচারের বিষয়টিও যুক্ত হতে লাগল তত্ত্বে। কাকুলের সামরিক অ্যাকাডেমিতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এদের শিক্ষার মূল নির্যাস ছিল— সামরিক বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। ইসলামি পাকিস্তানের শত্রু ভারত। সামরিক বাহিনী সৎ, রাজনীতিবিদরা অসৎ ইত্যাদি। আসল বিষয় হলো কর্তৃত্ব। 'আদর্শ' এভাবে হয়ে ওঠে ক্ষমতারক্ষার ঢাল।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর শাসকদের তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কারণ, সেখানে সমাজে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব ছিল বেশি। রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত কর্তৃত্ব করায়ত্ত ছিল সামন্তপ্রভুদের হাতে। হয়ত, অশিক্ষিত সমাজে ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য এ ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণ আদর্শের দরকার ছিল, গণতান্ত্রিক আদর্শের নয়।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে এই আদর্শ শাসকবর্গ বারবার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, পূর্ববঙ্গের সমাজ সামন্তসমাজ নয়। উঠতি মধ্যবিত্ত ছিল গণতন্ত্রমনা। ফলে ঐ আদর্শ বারবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছিলো। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, মনি সিংহ এবং সবশেষে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জের বিপরীতে শাসকদল ও তাদের সহযোগীদের সামনে দু'টি পথ ছিল। এক. চ্যালেঞ্জ মেনে নেয়া, দুই. চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা। শাসকরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলো এবং তাদের সহযোগীরাও তাদের সমর্থন যুগিয়েছিলো। সমর্থন যোগানোর কারণ, তা হলে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ক্ষমতার প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা এবং সেখানে থাকতে হলেও মতাদর্শগত একটি ঢাল থাকতে হবে মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য। সুতরাং এখানে

পাকিস্তানের সেই আদর্শটির রক্ষক হয়ে উঠল তারা। এটির একটি উদাহরণ পাঠ্যপুস্তক।

মার্কিন গবেষক ইয়েভেত রোজার এর ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পাকিস্তান যে আদর্শ (অতীতে ও বর্তমানে) প্রচার করতে চায় সেখানে ঐতিহাসিক সত্য দরকার নেই। আগে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে উপমহাদেশে প্রাচীন ইতিহাস, বিশ শতকের ইতিহাসের কিছুটা থাকতো। সামরিক শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বিষয় উধাও হয়ে যেতে লাগলো। পাকিস্তানের ইতিহাসের শুরুই হয় মুহম্মদ বিন কাসেমের সময় থেকে। আমাদের এখানেও পাঠ্যবই সেভাবে বদলে যেতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের *পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টির* কথা মনে পড়ছে। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার বইটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিএনআর (ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন) গঠিত হয়। কিন্তু এ অঞ্চলে সচেতন মানুষের কারণে এ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

এই দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এক সময় আওয়ামী লীগই শাসকদের বিরুদ্ধে প্রধান দল হয়ে ওঠে। ছয় দফা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আদর্শের বিপরীতে বাংলাদেশ আদর্শের রূপটা স্পষ্ট হতে থাকে। এর প্রবক্তা হয়ে ওঠেন মুজিব। তাঁর দলও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে এ অঞ্চলে। শেখ মুজিব পরিণত হন বঙ্গবন্ধুতে। বাংলাদেশের স্বপ্নটা তখনই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

৩৪

১৯৫২ সালের পর পাকিস্তান আদর্শ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় ১৯৭১-এ। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা তাঁদের দেয়া সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন, বাঙালির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ তাঁদের পছন্দ হয়নি এবং তাঁরা জানতেন একসময় পাকিস্তান থেকে বিযুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠবে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকেই মানসিকভাবে তারা এজন্য প্রস্তুত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলার জন্য ১৯৭১ সাল ছিল একটি অজুহাত। কিন্তু সেটি যে অজুহাত, এটি

স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানি শাসকরা বুঝতে দিতে চায়নি। কারণ তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানও কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে।

১৯৭১ সালে, বাংলাদেশবিরোধীদের সামনে দু'টি পথ ছিল। বাংলাদেশ সমর্থন অথবা পাকিস্তান সমর্থন। বাংলাদেশ সমর্থন করলে রাজনৈতিকভাবে তাদের অস্তিত্ব থাকে না। আদর্শগত অবস্থানও নস্যাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান সমর্থনই ছিল স্বার্থগত দিক থেকে কাম্য। এ ছাড়া, তাদের পক্ষে একথা গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করার ব্যাপার ছিল যে, তাদের আদর্শের ধারাবাহিকতা আছে। তারা সৎ, অন্যরা নয়। এ কথাটিই কিন্তু সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁর আত্মজীবনীতে বার-বার বলতে চেয়েছেন। বাংলাদেশবিরোধী আদর্শ ফলে ১৯৭১ সালে পরিণত হয় রাজাকারী আদর্শে। এ আদর্শ নিয়ে লড়াই করার আরেকটা বড় কারণ ছিল এই যে, তাদের অটুট বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান বাহিনী অজেয়।

পাকিস্তান আদর্শ কীভাবে চুঁইয়ে পড়েছিলো নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা পাকিস্তান ভাঙার জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করেন, সেগুলো হলো—

১. হিন্দু শিক্ষকরা বাঙালিদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। ফলে হিন্দুত্বের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি।

২. ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে প্ররোচিত করেছে বিদ্রোহে এবং লড়াইটি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের।

৩. ১৯৭১-এর যুদ্ধটা ছিল গৃহযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ হলো ভারতের অনুগত একটি দল। আওয়ামী লীগার ও সমর্থকরা সে কারণে ভারতের এজেন্ট।

৪. সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তারাই পাকিস্তান রক্ষা করবে।

৫. মুক্তিযোদ্ধারা দুষ্কৃতকারী।

৬. পাকিস্তান ভাঙার জন্য ইয়াহিয়া ভুট্টো মুজিব দায়ী।

রাজাকারদের ভাষ্যগুলো পড়লে দেখা যাবে উপর্যুক্ত কথাগুলোই তারা বলছে এবং এখনও তাদের ও তাদের সমর্থকদের বক্তৃতা-বিবৃতির ধাঁচ সেই একই রকম। তারাও বলছে, হিন্দু ভারত পাকিস্তান ভেঙেছে। এটি ছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ (অন্তিম লড়াই)। ১৯৭১ সালে যা ঘটেছিলো তা হলো গৃহযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা দুষ্কৃতকারী (সাজ্জাদ হোসায়েনের ভাষায় 'গ্যাংস্টার')। মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থকরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ধামাধরা, ভারতের দালাল এবং পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং ভারতই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র শত্রু।

৩৫

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যেসব রাজাকার আত্মজীবনী লিখেছেন, তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। শুধু তাই নয়, রাজাকারি আদর্শের প্রতি যেসব শিক্ষিত অনুগত তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। এ কারণে, রাজাকাররা মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা আগে যা ছিল এখনও তা-ই আছে। এবং তা আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু সবসময় একে সমর্থন করা হয় এবং এ সমীকরণটি তুলে ধরা হয় ইসলাম = মাদ্রাসা। যে কারণে, এখনও মাদ্রাসার সমর্থনে অনেক রাজনৈতিক দল সোচ্চার, যদিও তাদের কারও সন্তান মাদ্রাসার ছাত্র নয়। তাদের ধারণা, গ্রামের অশিক্ষিত মানুষকে এভাবে উত্তেজিত রেখে দলে টানা যাবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সহজ হয়ে যায়। অথচ, এ সমীকরণটি সম্পূর্ণ ভুল।

মাদ্রাসা সনাতনী ধারণার প্রতীক। এই ভুল ধারণার ফলে সমাজের একটি অংশে বিশেষ করে গ্রামীণসমাজে সনাতনী ধারণা চক্রবৃদ্ধি হারে আধিপত্য বিস্তার করছে। আবুল মোমেন মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন— "মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলানারা অধিকাংশ সামাজিকভাবে এমন এক রক্ষণশীলতার পক্ষাবলম্বন করে থাকে যা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নানারূপ কূপমণ্ডুকতাকে প্রশ্রয় দেয়।" যে কারণে, আমরা দেখি, প্রাক্‌চল্লিশের মাদ্রাসার ছাত্র সাজ্জাদ হোসায়েন ও ষাটপরবর্তী মাদ্রাসার ছাত্র খালেক মজুমদারের চিন্তার মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। থাকে না।

১৯৪১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির সদস্য মৌলভী মোজাম্মেল হক লিখেছিলেন, "সংস্কারের চেষ্টা চালিয়েও গত এক শ' বছরেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসায় সবচেয়ে বড় সঙ্কট এই খানেই যে, শিক্ষাঙ্গন হওয়া সত্ত্বেও এখানে তত্ত্ব ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ, পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পরিবেশ অনুপস্থিত। নানা সংস্কার ও পরিমার্জন ও উন্নয়ন সত্ত্বেও সম্ভবত একারণেই মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজ ও জাতীয় জীবনে কোন বড় অবদান রাখতে পারছে না।" [আবুল মোমেনের পুস্তিকায় উদ্ধৃত]

এ মন্তব্যের আরো ৫০ বছর পর একথা বলতে হয় যে, এখনও সংস্কারের চেষ্টা দূরে থাকুক বরং মাদ্রাসা শিক্ষা পরিপুষ্টির একটা প্রচেষ্টা সবসময় নেয়া হয়। কারণ, একে ঘিরে রয়েছে অবৈধ অর্থ রোজগার, ধর্ম ব্যবহার করে প্রতিপত্তি অর্জন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি। এসব কিছু আরো বেশি অর্থলাভের উপায় করে দেয়। ফলে, জাতীয় জীবনে সঙ্কট আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাবে। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষা কোন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে না।

মাদ্রাসা শিক্ষিতরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বিরোধিতা করেছে, করছে এবং করবে। পাকিস্তান আদর্শের প্রতি তারা যতটা আত্মিক টান অনুভব করে, বাংলাদেশ আদর্শের প্রতি ততটা নয়। 'মাদ্রাসা ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে একটি সমীক্ষায় লিখেছেন আবুল মোমেন, "জাতীয় চেতনাবিহীন এই শিক্ষার আরও ভয়াবহ বিকৃতির প্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়। কি ওহাবী কি সুন্নী বাংলাদেশের প্রায় সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম একেবারে হাতে গোনা দু'চারটি। অধিকাংশ মাদ্রাসা পাকিস্তান রক্ষার দুর্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাকে জিহাদ হিসেবে ধরা হয়েছিল। এখনও মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে অনেককে পাওয়া যাবে যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র নিয়েছিল। পরবর্তীকালে এর বিরোধী যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে তাতে শরিক হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের ধারায় নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন যুগিয়েছে। তাই দেখা যায়, মাদ্রাসার বিকাশ ও বিস্তারের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও আদর্শের বিরোধী চেতনার যেন শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।"

মাদ্রাসার নামে টাকা আদায়, বিদেশী অনুদান গ্রহণ, পীর সংস্কৃতির বিকাশ— এ সমস্ত করে একধরনের শোষণ বজায় রেখেছিলো এ চক্র। বাংলাদেশ হওয়ার পরও সে প্রক্রিয়া থামেনি। বরং আরো প্রশ্রয় পেয়েছে। কারণ সেই একই— ধর্মের জুজু। আবুল মোমেনের ঐ রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, "অধিকাংশ মাদ্রাসা দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ভরা। এই মাদ্রাসাসমূহ সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিবছর বার্ষিক সভা, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি থেকে ভাল অংকের চাঁদা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া অনেক মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহের কাজে লাগায়।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, ১৯৭১ সালে অধিকাংশ মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বিপাকে পড়ে। কারণ, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তারা পরিবর্ধিত হতে পারে না। ১৯৭৫ সালের পর তারা অবলম্বন পেয়ে যায়। এর উদাহরণ, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সালের ভেতর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভূত বিস্তার। এবং এ কারণেই, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধীদের একটি শক্তিশালী কনসটিটিউন্সি তৈরি হয়েছে যা বাংলাদেশের আধুনিকায়নে একটি প্রতিবন্ধক।

৩৬

রাজাকারদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তারা কৌশলী। অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা করতে সে পিছপা হয় না। ১৯৭১ সালের ঘটনার মধ্যে তারা অমানবিকতা খুঁজে পায় না। পাকিস্তানিরা বলে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়নি। রাজাকাররাও তা-ই বলে। কিন্তু আজ প্রায় ২৯ বছর পর বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যে-সববধ্যভূমি পাওয়া গেছে তা কোন সত্য তুলে ধরে?

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৭১ সালে গোলাম আযমের ভূমিকা কী ছিল তা বাঙালি মাত্রেরই জানা। এমনকি কেউ যদি প্রমাণের কথা বলেন তা হলে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার খবরই বড় প্রমাণ। হানাদার বাহিনীর তিনি শুধু অন্যতম সহযোগীই ছিলেন না, হত্যা, খুন, ধর্ষণের জন্য প্ররোচিতও করেছিলেন। কিন্তু রাজাকাররা একথা কখনোই স্বীকার করবে না। শেখ আখতার হোসেন *জননেতা গোলাম আযম* গ্রন্থে লিখছেন--"পাকিস্তানের সামরিক সরকার যখন দেশ ও জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে হত্যা, জুলুম ইত্যাদি শুরু করলো তখন গোলাম আযম চুপ করে থাকেননি। মানুষ মরবে আর তিনি দেখবেন সে রাজনীতি তিনি করেন না। তাঁর জন্মভূমি পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাযত করার ক্ষেত্রে সে দেশের নাগরিক হয়ে যতটুকু দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাই বলে দেশের মানুষকে হত্যা করতে হবে, এমন চিন্তার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ সত্য কথা বিরোধীদের জানা থাকলেও তারা এখন তা স্বীকার করবে না। ১৯৭১ সালকে তারা গোলাম আযমের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন গোলাম আযম তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এদেশের নিরীহ নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা যুগ কাল ধরে বলেও দেশের মানুষকে বোকা বানানো যায়নি। এবং যে ভারত ১৯৭১ সালে দেশের বন্ধু হিসাবে পরিচিত ছিল ভারতের বন্ধুরাই পরে জনপ্রিয়তা হারালো। গোলাম আযম যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বরং আরও বলা যায় তিনি এখন দেশের ইসলামী জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা।

১৯৭১ সালের ঘটনায় গোলাম আযমকে যে দৃষ্টিতেই দেখা হোক এটা সত্য যে তিনি গণহত্যার সাথে কোন দিক দিয়েই জড়িত ছিলেন না। কোন সরকারই তার প্রমাণ দিতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও আদর্শিক কারণেই তাঁকে স্বাধীনতা-বিরোধী বলা হয়।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দিলাম এ কারণে যে, রাজাকারদের সম্পর্কে আগে যে মন্তব্য করেছি তা প্রমাণের জন্য। এখানে প্রচার করা হচ্ছে, গোলাম আযম কোনোকিছুর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন না। তার একটি আদর্শ আছে যা অনেকের পছন্দ নয় তাই তাকে স্বাধীনতাবিরোধী বলা হয়। অর্থাৎ তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটের সঙ্গে জড়িত নয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পার্থক্য আদর্শিক। তেমনি, জামায়াতের সঙ্গে অন্যান্য দলের পাথর্ক্য আদর্শিক। ১৯৭১ একটি অজুহাত মাত্র।

এ কারণেই, ১৯৭১-এ যে তারা ভুল করেনি তা সগর্বে সভাসমিতিতে ঘোষণা করে সেই আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা প্রমাণের জন্য। আর ১৯৭১ সালে কি বাংলাদেশে কোনো হিংস্র বা অমানবিক ঘটনা ঘটেছিলো? এ প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চুপ থাকে বা এড়িয়ে যায়।

মার্কিন গবেষক ইয়েভেৎ রোজার এ বিষয়ে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"Denial and erasure are the primary tools of historiography as it is officially practiced in Pakistan." পাকিস্তান সরকার ও তার সহযোগীরা তাদের প্রচারমাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে এ কাজটি করে থাকে। তিনি জানিয়েছেন, সেখানে শিক্ষকরা ১৯৭১ সালের "আসল" ঘটনা বলে না চাকরি হারাবার ভয়ে। আমার অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম। পাকিস্তানি জেনারেল, সচিব, বুদ্ধিজীবী অনেককেই ১৯৭১ সালের গণহত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা কিছু জানেন না। (দু'একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়)। ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তাঁরা একই কথা বলছেন, রাজাকারদের ভাষ্যও সেই একই রকম।

পাকিস্তানের জনগণ বিশ্বাস করতো পাকি সেনাবাহিনী অজেয়। ১৯৭১ সালেও তারা জয়ী হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রায় এক লক্ষ অজেয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করল তখন তাদের মনোজগতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। যে কারণে, ইমেজ তৈরির জন্য তাদের আফগানিস্তানে যেতে হয়েছিলো। মুক্তিবাহিনীর বিজয়ও সেই একইভাবে এখানকার রাজাকারদের মনোজগত চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। তাদের আত্মজীবনীগুলো তাই তুলে ধরে।

সেই অবস্থা থেকে রাজাকাররা আবার নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। পুরনো ক্রটি শুধরে আবার নতুন করে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করছে। রাজাকারবাদের উপাদান হিসেবে আবার ভারত-বিরোধিতা, ইসলামী উম্মার নামে পাকিস্তানি ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা ও ইসলামের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি—এ সবকিছুই যুক্ত

করেছে। তাদের সহযোগী হিসেবে আছে কয়েকটি বড় দল। এবং লক্ষণীয় যে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে তারা সেসব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গড়তে চায় যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিরোধী ছিল।

৩৭

স্বাধীন বাংলাদেশে আবার রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ১৯৭১ সালে তা কেউ ভাবেনি। এমনকি ১৬ ডিসেম্বরের পরও রাজাকারদের তা মনে হয়নি। কিন্তু তা হয়েছে, এবং এর জন্য আমরা সবাই কমবেশি দায়ী। যুদ্ধাপরাধীদের আমরা বিচার করিনি বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সহযোগী করে তুলেছেন। সহযোগী না হলে এখনও কেন অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজাকারদের বক্তব্যের এতো মিল থাকে?

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে দু'ধরনের যুদ্ধাপরাধী ছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার। এ বিষয়ে জে. এন. দীক্ষিতের সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ *'লিবারেশন অ্যান্ড বিয়োন্ড ঃ ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস'*-এ নতুন অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দীক্ষিত জানিয়েছেন, পাকিস্তানি বাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু এপ্রিল ১৯৭২-এর মধ্যে শেখ মুজিব এ সংখ্যা হ্রাস করে প্রথমে ১৯৫ এবং তারপর ১১৮তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি। তাঁর মতে, " One wonders whether this was deliberate on the basis of some understanding through back channels between Bangladesh and Pakistan at that time or whether it was a zenuine failure of not being able to gather credible evidence for an international court to try these war crimes. There was no doubt among Bangladeshi public that war crimes had heen committed."

এই যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তাই চাইছিলো। দীক্ষিতের বই পড়ে তা-ই মনে হয়, যদিও কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেননি। শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা

মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে, "The substantative motivation for Mujib's decision might have been his long-term strategy of not doing anything which would prevent recognition of Bangladesh by Pakistan and other Islami countries; ... In the larger interest of peace and normalcy in the sub-continent Mujibur Rahaman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কি প্রার্থিত "stability" এসেছে ? না উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে?

তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ তাঁর *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম* গ্রন্থে লিখেছেন, দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তৎকালীন "সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিল না"। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন, রাজাকারদের বিচার শুরু হয়েছিলো এবং দালাল আইন জারির পর "১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এতসব আইনগত বিধান, ছাড় ও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২,৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। তার মধ্যে মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়। বাকি অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাশ পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টির এবং দিনে ৩/৪টির বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।"

এরপর তিনি অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক চাপ, একই পরিবারে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার— দুই-ই ছিল। এবং রক্ত-সম্পর্কের কারণে অনেকে রাজাকারদের বাঁচাতে চেয়েছিলো। রাজাকাররাও তাদের আত্মজীবনীতে এ ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ ত্রিশ বছর পর প্রশ্ন জাগছে, ঐসব যুক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় কি সমাজে, রাজনীতিতে শান্তি এসেছে? আসেনি। কারণ, রাজাকারদের চরিত্রবিচার সে সময় করা সম্ভব হয়নি। এ প্রশ্ন সোচ্চারিত হয়ে ওঠেনি যে, যে অনুকম্পা রাজাকারদের প্রতি দেখানো হয়েছে সে অনুকম্পা কি রাজাকাররা প্রদর্শন করেছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? বা কখনও কি তারা স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছিলো? এসব প্রশ্নের উত্তর—না। হত্যার বিচার না হলে সভ্যতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। তা হলে যত চাপই থাকুক রাজাকারদের বিচার করাই উচিত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা রাজাকারদের প্রতি

আমরা অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি। তাদের পুনর্বাসিত করেছি এবং আজ আবার রাজাকারদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু যে ত্রিশ লাখ শহীদ হলেন তাঁদের প্রতি কি এ পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য বিচার করা হয়েছে? তাঁদের প্রতি কি যথাযথ মর্যাদা দেখানো হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরও হচ্ছে—না। এ প্রসঙ্গে দীক্ষিত-উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যুদ্ধাপরাধী রাও ফরমান আলিকে যখন কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন, ভারতীয়রা ভাবছে বাঙালিদের সাহায্য করেছে দেখে বাঙালিরা তাদের পক্ষে থাকবে? থাকবে না। কারণ, "They had no capacity for gratitude" হয়ত, এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। কিন্তু ১৯৭১-পরবর্তী ঘটনাবলী কি এ মন্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে না?

আজ ত্রিশ বছর পর আমরা দেখছি, ঘটনাবলী যেন একটি বৃত্ত পূর্ণ করার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। রাজাকারদের বিচারের দাবি উঠছে এবং তা করছেন প্রধানত তাঁরাই যাঁরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। বরং রাজনৈতিক দলের একটা বড় অংশের বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাজাকারবাদের বিভিন্ন উপাদান ফিরে আসছে। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশে এমনটি ঘটেনি। আর কোনো দেশে এমনটি ঘটেনি যে, দুর্নীতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে এ কলুষ থেকে মুক্ত রাখার একটি উপায়ই আছে, স্বাধীনতা মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছিলো তা রক্ষার একটি উপায়ই আছে এবং তা হলো প্রতিনিয়ত বলে যাওয়া— যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার।

১৮৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তী

এতদ্বারা কুড়িগ্রাম মহকুমাবাসীদিগকে জানান যাইতেছে যে, প্রায় দীর্ঘ দুই মাস যাবৎ কুড়িগ্রাম শহরে লোকজন না থাকায় এবং দোকানপাট বন্ধ থাকায় সাময়িক যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, আল্লার রহমতে বর্ত্তমানে উহা সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক দোকানপাটে বেচাকেনা, দৈনিক দুইবেলা বাজার, হাট এবং লোকজন বসত শুরু হইয়াছে।

সমস্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের কাজে যোগদানের ফলে যাবতীয় অফিস আদালতের কাজ, সকল স্থানে ট্রেন যোগাযোগ এবং মালপত্র নিরাপদে আমদানী-রপ্তানীর কাজ যথাযথভাবে চলিতেছে।

এমতাবস্থায় শহর এবং গ্রামাঞ্চলবাসী সকলপ্রকার নাগরীকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আবেদন করা যাইতেছে যে :—

১। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বসতবাটী দোকানপাটে ফিরিয়া আসিয়া নির্বিঘ্নে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদিতে রত হউন।

২। মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পর্য্যায়ে সৎ চরিত্রবান খাঁটী ইসলাম পছন্দ পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে শান্তি কমিটী গঠন করতঃ নিজ নিজ এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা বজায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৩। শিক্ষক মহোদয়গণ স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রীতিমত কর্ত্তব্যরত থাকিয়া ছাত্র-ছাত্রীদেক আদর্শ শিক্ষায় তাহাদের মূল্যবান ভবিষ্যৎকে সুগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

৪। বিচ্ছিন্নতাবাদী, দুষ্কৃতিকারী এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মিথ্যা প্রচারকদেরকে সংশোধন করুন অন্যথায় প্রয়োজন হইলে এ ব্যাপারে থানার পুলিশ এবং সামরীক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করুন।

৫। চুরি, ডাকাতী, রাহাজানী এবং লুটতরাজকারীদেক কঠোর হস্তে দমনের জন্য স্থানীয় শান্তি কমিটীর মাধ্যমে থানায় রিপোর্ট করুন।

৬। হিন্দুদের পরিত্যক্ত (Aboundent) বসতবাড়ী দোকান মালামাল এবং জমিজমায় কেহ বে-আইনী ভাবে প্রবেশ আত্মসাৎ কিম্বা বে-দখল করিলে শান্তি কমিটীর মাধ্যমে থানায় রিপোর্ট করুন।

* "স্থানীয় স্বাভাবিক অবস্থার সাথে স্ব স্ব উন্নতি বিধানই সামগ্রীকভাবে দেশের উন্নতি সাধন"
পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

—প্রচার বিভাগ—
কুড়িগ্রাম শহর শান্তি কমিটী।

মহকুমা শান্তি কমিটী
কুড়িগ্রাম।

জরুরী ঘোষণা

বিগত গোলযোগের সময় বেশ কিছু সংখ্যক কয়েদী এবং হাজতী-আসামী কোন কোন জেলখানা হইতে পলাইয়া গিয়াছে ও উহারা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন ও শৃখলা বজায় রাখার কাজে বিঘ্ন ঘটাইতেছে।

এইসব অপরাধী লোকদিগকে পুনরায় বন্দী করিতে না পারিলে দেশের জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না।

অতএব, ঘোষণা করা যাইতেছে যে, যাহারা এইসব পলাতক কয়েদী ও হাজতী আসামীদিগকে ধরাইয়া দিবেন বা গ্রেফ্‌তার করিতে সাহায্য করিবেন তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

জেলা প্রশাসক,
রংপুর।

১৫।৬।৭১

আল্লাহু আকবর।
পাকিস্তান—জিন্দাবাদ।

সর্বদলের আহবানে প্রতিবাদ দিবস।

ভাইসব,

পাকিস্তানের সৃষ্টি চক্রান্তকারী ভারত কোনদিনই সহ্য করতে পারেনি। এর জন্ম লগ্ন থেকেই বিভিন্ন উপায়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করে মুসলিম বিদ্বেষী ভারত বার বার হামলা করে দুনিয়ার বুক থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলতে চেয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ভারত মানবতা বিসর্জন দিয়ে ১৯৬৫ সালে অতর্কিত বর্বর হামলা করে ছিল চোরের মত। আল্লাহর অপার মেহের-বাণীতে পাক সেনা বাহিনী তাদের দাঁত ভাংগা জবাব দিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছে। বার বার পাক বাহিনীর হাতে মার খেয়ে চক্রান্তকারী ভারত এদেশের মীরজাফর ও বিভীষনদের কাজে লাগাচ্ছে পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য। ভারতীয় চর ও দুষ্কৃতি-কারী পাক ভূমিতে পাঠিয়ে রাস্তা, ঘাট, পুল সেতু ও জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে চাচ্ছে এবং সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করে অযথা গোলাবর্ষণও ক্ষয়ক্ষতি করছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের নগ্ন হামলা ও বর্বরোচিত কাজের প্রতিবাদে শেরপুরের সর্ব্বদলের পক্ষ থেকে আগামী ২৭শে নবেম্বর রোজ শনিবার প্রতিবাদ দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রতিবাদ দিবসে বেলা ২ ঘটিকার সময় শেরপুর স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জন সভা অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা যথা সময়ে যোগদান করে প্রতিবাদ দিবসকে সার্থক করে তুলুন।

ভারতের দালালদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে মিছিলসহ উক্ত সভায় যোগদান করে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করুন।

আয়োজনে—

শেরপুর সর্বদলের পক্ষে
সার্কেল পিচ কমিটি

বি: দ্র: —ইউনিয়ন শান্তি কমিটি, ডিফেন্স পার্টি ও ইউ, পি, চেয়ারম্যান সাহেবদের উপর মিছিল আনার দায়িত্ব রহিল।

আল্লাহু আকবর।

পাকিস্তান 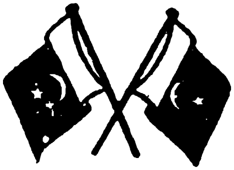 জিন্দাবাদ

বিরাট জনসভা

২৪শে অক্টোবর—বিকাল ৩ঘটিকা

স্থান :—গৌরীপুর কাছারী মাঠ

সভাপতি—আলহাজ মহাঃ আবদুর রহমান, জামালপুর মহকুমা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি।

প্রধান বক্তা—মওলানা মহাঃ আবদুল জব্বার মোমেনশাহী জেলা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি।

বক্তৃতা করিবেন :—

১। এস, এম, ইউসোফ আলী
সহ-সভাপতি, শান্তিকমিটি।

২। অধ্যাপক শরীফ হুসাইন
সম্পাদক, মহকুমা জামায়াতে ইসলামী।

৩। অধ্যাপক মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য।

মহোদয়, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা পূর্বক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানবাদী নাগরিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করুন। দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য আহূত জন সভায় দলে দলে যোগদান করিয়া সভাটিকে সাফল্য মণ্ডিত করুন। ইতি—২২/১০/৭১ ইং

আরয গোযার—
জামালপুর মহকুমা জামায়াতে ইসলামী
প্রচার দফতর।

খান প্রিণ্টার্স, জামালপুর।

শহীদ দিবস উপলক্ষে

জনসভা

স্থান—টাউন হল ময়দান

সভাপতি—জনাব সৈয়দ শামছুর রহমান

তাং—১৬।৭।৭১ শুক্রবার বৈকাল ৪টা

ভাইসব !

আচ্ছালামু আলায়কুম।

আসছে শুক্রবার বৈকাল ঠিক ৪টায় যশোর টাউন হল ময়দানে জেলার ২১ জন বীর রেজাকারের আত্মত্যাগের জন্য তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হবে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে শত্রুর মোকাবেলায় উহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে অমর হয়েছেন।

আসুন দলে দলে সভায় যোগদান ক'রে অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।

আমজাদ হোসেন
সম্পাদক
যশোর জেলা শান্তি কমিটি।

জেলা পরিষদ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রচার সম্পাদক মৌঃ হারেজ উদ্দীন আহম্মদ কর্ত্তৃক প্রচারিত।

Al-Helal Printing & Publishing Co., Ltd.
(*Regd. Office Observer House, Motijheel, Dacca*)

Publishers of :
THE DAILY PAKISTAN OBSERVER
THE DAILY PURBODESH
THE CHITRALI

General Office :
"OBSERVER HOUSE"
MOTIJHEEL C/A
DACCA-2 East Pakistan
Phone PBX 254115-254117
Gram GOODPRINT, DACCA

September 16,1971

Chairman,
Sub-Divisional Peace Committee,
Kurigram.
PO Kurigram, Rangpur

Dear sir,

As you must have observed, we have been contributing our mite through the columns of our publications, The Pakistan Observer, Purbodesh and Watan, to help restore normalcy in the province and to encourage people to be at their posts and to resist miscreants at all levels.

The Peace Committees and the Razakars have been doing excellent work to meet the challenge of the miscreants from within and from across the border. As we have not yet been able to reconstitute the team of our mofussil correspondents, we are unable to collect and cover all what you have been doing to encourage others. We hope, we shall soon be able to re-establish our own news services at all subdivisions of the province.

Meanwhile, we shall be grateful if you would please send us occasional notes (in your letter heads to assure genuineness) indicating the activities of the Government departments, Peace Committees and the Razakars etc specially, their success stories in combating the miscreants with specific details. All these will be most welcome to our readers and extremely helpful in the psychological rehabilitation of the people in general.

With kindest regards,

Yours faithfully,

[signature] 16/9/71
Managing Editor.

me;ka;ah;
P.S: We shall also welcome statements of the returnees from India of their experiences there.

To

The Martial Law Authority .

Jessore .

Through ,

The Deputy Commissioner .

Jessore .

Sir ,

Allotment of One House Left over by Hindu .

I beg to request your honour to consider my problem created by the collapse of the verandah of my residential house on MistriKhana Road , Jessore and I have to vacate the same at the direction of the Deputy Commissioner , Jessore for safety of my lif and my fa,ulies .

Now , I have become shelterless and hopeless and I do not know where to take shelctr for the purpose . I would request your honour to kindly consider my case and allow me to take sheletr in any of the suitable house legt over by Hindus for the present .

For which act of kindness I shall be highly obliged and grateful

Yours Faithfully.

Md. Quamruddin

Chairman. 28/6/71

Town. Peace & Welfare Committee,

Jessore.

Dated. Jessore

The 28th. June 19,

পরিশিষ্ট : ৮

Epilogue

—The Editor

A large part of the present book was composed in, 1972 and 1973 and records the writer's reactions to the rude shock that the reality of Bangladesh dealt to his dream of independence and the hopes he entertained for the future. One feels tempted to bring the account up to date and to investigate how far the gloomy prognostications with which it is replete have been borne out by events. Bangladesh is today a member of the United Nations; its foreign ministers attend international conferences; it boasts a flag of its own; it maintains embassies and legations in several countries; but the ineluctable fact from which it is impossible to avert one's gaze is that it is no more free than the East European states where for the purpose of her own protection Russia maintains standing armies. The noises that anti-Indian sentiment inside the country occasionally make barely conceal the truth that its independence is fictitious and it must in the last resort behave as India wishes it to behave. A political zombie with no will of its own, India is careful to avoid giving it the salt that would send it scurrying to its grave prematurely.

It is not that there is any dearth of sincere Bengalees who do not cherish the dream of a genuinely free and independent Bangladesh. But theirs is a shortsighted patriotism incapable of seeing beyond a few paces and struggling even now against the terrible and unremitting pressure of uncomfortable realities. What they do not seem to understand is that independence in the international context is a reflection of a country's strength, whether it be political or economic or cultural strength. And strength is what Bangladesh lacks. Strength does not mean the strength of a superpower, but it implies the ability to stand up to pressures and Bangladesh possesses none of it.

This is so partly because of the circumstances surrounding it and partly because its creators were not patriots but traitors

whose real intention was to sell their motherland to India and not to establish a free, independent state. The secret treaty which Tajuddin and his friends signed in India and whose clauses no subsequent Governement has had the courage to disclose sealed Bangladesh's before it had come into existence. Beginning with the scandal for the printing of currency notes which the author has discussed... every important issue that has subsequently arisen has been scaled in a manner which has betrayed Bangladesh's impotenc.

Berubari is an obvious instance. The Prime Minister of both India and Pakistan had formally agreed that Berubari was a part of East Pakistan and should be handed over to it. Upon one pretext or another, India kept delaying the implementation of the agreement but she did not renege on the treaty. Yet one of the first things Mujib did was to sign Berubari away and declare the satisfactory settlement of an outstanding issue which the wicked Pakistanis had been exploiting as a running sore. He had the to tell the public that the cession of Berubari to India hadput an end to unnecessary acrimony between friends. No one was allowed to protest.

Or, the case of the Ganges waters. Major General Ziaur Rahman, the present ruler, attempted at first to stir up a regular yhoo over the matter and took it to the U.N. The stage was set for a confrontation between David and Goliath. Then suddenly the dispute was withdrawn and an agreement reached with India whose terms are much worse than those discussed during Mujib's tenure. India has acquired the right to draw off even more water that she claimed in 1972. The first Farakka treaty between Mujib and Mrs Gandhi had given Bangladesh 45,000 cusecs of water per second. The latest agreement has reduced the quanitity to 34,000 cusecs. India also persuaded Bangladesh to agree in principle, to the construction of a canal across its territory to link up the Brahmaputra with the Ganges. Bangladesh is as a result threatened with the prospect of having a large part of its northern areas transformed into arid wastes. And this in spite of the advice of such Bangladeshi experts as B. M. Abbas!

Instances like these can be multiplied *ad infinitum*. They add up to an unflattering picture from the point of view of Bangladesh's *anour propre*. Not without reason did the Indian press start in 1972 describing Bangladesh as a province and its President as a governer. The practice stopped after strong protests from the Bangladeshi public. But no whitewashing can disguise the unpleasant reality of the country's status as a

satellite of India. East Pakistan, as an integral part of Pakistan, played a role in both domestic and international politics denied to Bangladesh.

What then has secession, or liberation as the Awami leaguers call it, achieved ? During the twenty-four years that united Pakistan endured, there was no question of India dictating any terms to the Government of East Pakistan; there was no question of the area being described as an Indian province; no question of its waters being drawn off or projects beneficial to India being thrust on it. Yet for the reality of this freedom Mujib, with the willing collaboration of a large group, substituted a status indistinguishable from that of a colony.

The seven years that have transpired since December 1971 when Bangladesh came into being have seen no change for the better. On the contrary, as the country's economic situation continues to deteriorate its utter helplessness is thrown into ever sharper relief...

The population of East Pakistan was about seventy-five million but at no time during the twenty-four years of Pakistan did so many starve. The period remained free from famine or for that matter from large scale shortages. Whatever the failings of the Pakistan Government— doubtless they were many— it succeeded in averting any disaster of the kind which struck Bengal in 1943 or the kind which took toll of twenty-four thousand lives in Rangpur district alone in 1974. The poignant irony of the contrast between the Pakistan period and the post-Bangladesh history of the area emerged from the sad fact that in 1974-75 the Bangladesh citizens paid four hundred Takas for a *maund* (40kg) of rice for which he was charged thirty rupees in Government ration shops up to December 1971.

One of the main promises in the Awami Leaue manifesto during the elections of 1970 had been that they would make rice available at twenty rupees a *maund*. And thee were millions of gullible voters who were persuaded that the thirty rupees they paid was an imposition due entirely to the wickedness of Central Government. But within the first six months of Awami League rule the price of rice climbed steadily from rupees (now called taka) thirty to forty, from forty to fifty, from fifty to sixty and so on to eighty, at which point Mujib's food minister, Phani Bhushan Majumdar, declared firmly that on no account would a rise beyond that figure be permitted.

But they had reckoned little with the forces of economic disequilibrium unleashed by the events of 1971; nor could they control the greed and rapacity of their own henchmen. So week after week the price level spiralled upwards until rice became so

scarce that even Takas 700 a *maund* did not appear unusual. The progress from 30 to 700 Taka in the course of about seven to eight months was a feat unequalled by anything in the history of the subcontinent's economy. And this was in spite of the millions of dollars poured into Banladesh's coffers in the form of foreign aid...

The economic calamities are paralleled by the state of insecurity visible all over the country. It is estimated that during 1972-73 and 1974 several thousand people lost their lives in the robberies, assassinations and murders which were every day experience in life under Mujib. Broad daylight assaults were a common phenomenon. Neither men nor women could cross a public thoroughfare with anything valuable on their person without fear of being assaulted by bandits. Even today, although there has been some improvement, order has to be maintained by the enforcement of a daily curfew. The public, in spite of the inconvenience that this causes, does not dare ask for a change; it knows that only round the corner the forces of social disorder and anarchy lie in wait.

People remember nostalgically that not even during the Indo-Pakistani war of 1965 did they have to put up with anything of this sort. So once again it would be no exaggeration to say that they have exchanged peace and security for lawlessness and anarchy. Yet how strident had been Mujib's criticism of the restrictions on freedom attributed to Central Government at Islamabad.

Of the development of politics and political institutions, the less we say the better. President Ayub's administrative system, which was presidential in character, had been derided as being an insult to the intelligence of the electorate. The public used to be told that a return to parliamentary democracy would be a panacea for all their ills, that it would not only restore political freedom but give East Pakistan a new cultural vitality. Yet paradoxically Mujib was forced to eat his own words, scrap the apparatus of parliamentary democracy and institute a form of personal dictatorship far more irresponsible than anything conceived of by Ayub.

The new party, BAKSAL (Banglaesh Krishak Sramik Awami League), which Mujib launched a few days before his death was designed on the model of the Communist Party of the USSR to hold the whole country in its grip. Even the bureaucracy was to be made completely subservient to it in order that the party might do what it pleased. A scheme for the appointment of sixty governors armed with the powers of gauleiters had been drawn

up. The *coup* of August 1975 delivered Bangladesh providentially from the threat of an unparalleled tyranny.

Bangladesh today remains a country without much sense of purpose or identity. There is an effort to erect some kind of *post-facto* nationalism, but actually on the remains of Muji secularism. So the outcome can well be foreseen.

Culturally, the situation is also bleak. The flood of Indian books which have been pouring into Bangladesh ever since 1972 has practically destroyed the nascent publishing trade which had grown up slowly over two decades in East Pakistan. Bangladeshi publishers with small investment capital have been no match for their Indian counterparts. Those who still survive are literally panting for breath. What the Indian publishers cannot do directly is being done by an India-financed firm called Muktadhara. Its proprietor is one Chitta Saha, who seems to have inexhaustible resources at his disposal. His policy has been to sign up as many local writers as possible and get them to write books tailored to the philosophy that Bangladesh and India have an identity of culture. History is being given a new twist. Anything specifically Islamic whether in art or literature or religion is being played down, and sometimes at the expense of tangible and well-known facts the theory is being nurtured that Hindus and Muslims have never been different and that it is only the mendacios propaganda of the Muslim League which caused ill-feeling between the two communities.

Deprived thus of his pride in past Muslim achievements, the Muslim writer has a hard time adjusting mentally to Hindu myths and legends which he cannot swallow without disowing a lage part of his psychical heritage. He cannot write at ease on non-Muslim subjects which his Hindu counterparts can handle infinitely better; what used to be called Muslim culture he is called upon to treat as alien to the Bengali concept of life. Caught between the upper millstone of his Islamic upbringing and the nether millstone of the new official creed of secularism, he has been virtually reduced to artistic silence. It is thought by those who have been observing this carefuly that Bangladesh would soon cease to have a cultural identity of its own.

How ridiculous in the light of what is happening now appears Mujib's assertion that East Pakistan was in danger of being swamped by Urdu culture superimposed from Islamabad! Mujib used to tell his audience that one aim of his struggle was the preservation of the Bengali Muslims' cultural personality. It seems that the Awami League recipe for saving the cultural personality of Bangladesh is to persuade it to forget that it has an identity apart from India's. Strong logic no doubt, but the Bengali Muslim who allowed himself to be fooled by this claptrap

must be ruefully comparing his position today with the status he enjoyed in united Pakistan.

Educationally, the years since 1972 have been a veritable nightmare. Not to speak of being able to establish new universities and colleges, of which Bangladesh stands sorely in need, or even adding to the numbe of schools which are needed rather more urgently, the Government has helplessly watched academic standards deteriorate to a point where academic degrees and certificates are positively no clue to intellectual competence. One of Mujib's first acts was to cancel all examinations held in 1971. Students who took the examinations and teachers who conducted them were declared collaborators. Thousands of young people suddenly found themselves deprived of hard-earned degrees and diplomas. The examinations which Mujib's government proceeded to organise in 1972 and 1973 were a regular farce. Young men and women who had worked for the *Mukti Bahini* were awarded certificates and degrees almost free; cheating and corruption were condoned on the ground that the country could not afford to enforce the same standards as before in the fluid circumstances of the day.

Not content with distributing virtually free degrees and certificates as a reward for participation in the civil war, Mujib went on to fill universities, colleges and schools with loyal party placemen. Irrespective of whether a *Mukti Bahini* candidate had a first or a third class degree his claims to employment were preferred to those of others. Overnight, every faculty found itself packed with men and women whose sole qualification was their loyalty to Mujib. When the post of Professor in the Department of English in the University of Dacca fell vacant, a man was brought in who had never done a day's teaching in any university anywhere, who had no research qualificatons, but whose commitment to the cause of Bangladesh was beyond reproach. One of the members of the selection committee, a committed leftist with a degree from Oxford prostituted his academic honour so shamelessly as to write that the Awami League candidate just mentioned would be an asset. A political asset indeed he is, but it takes some intellectual effort to understand that Bangladesh is a country where even in the highest seats of learning party loyalty is considered of much greater importance than academic worth.

The less we say about the academic standards at the lower level the better. Schools which were converted during the last twenty-four years of Pakistan into Awami League bases continue to be breeding grounds of thieves, robbers and bandits; teachers

whose academic conscience is sometimes aroused by this anarchy are either shot straightaway or thrown out.

On the other hand, scores of loyal academics were promoted to senior posts overnight regardless of qualifications. Lecturers with no books or research to their credit were raised to the status of Associate Professors; Assistant or Associate Professors who had never published a book or even a paper and who were lucky to be on the faculty of a university at all were made Professors. Some teachers who had fled to India in 1971 and helped organise the campaign against Pakistan were rewarded with diplomatic posts or seats in the cabinet or jobs as chairmen of important commissions. One aged academic reputed never to have written a line was elevated to the rank of a National Professor, which meant permanent tenure until death sans obligations or responsibilities.

The example of these appointments and promotions has not been lost on the younger generation. They know that in the changed context in Banglaesh the way to climb to the upper rungs of academic office is to ingratiate oneself with the party in power rather than burn the midnight oil or spend time in laboratories. The appalling deterioration in intellectual standards has been so marked that it has begun to disturb even those who have profited from it.

One consequene of the anarchy characteristic of Bangladesh today has been that the bureaucracy has grown more powerful than it has ever been. However corrupt and greedy the civil servants, they are the only people who know something about administration and they have turned this to maximum advantage against the background of the ignorance and stupidity of the new political masters. In spite of the oftrepeated criticism of the bureaucrats Mujib came towards the end to rely more and more on them for whatever measures he instituted. The situation has grown worse since. Where nobody knows much the tin gods who preside over the secretariat are the only ones who know how to keep the show going. That gives them enormous leverage over the politicians and the rest of the population, and it is an advantage they both cherish and exploit. The Awami League's campaign against the bureaucrats and the clumsy manner in which Mujib tried to destroy their power base has in fact had the effect of saddling Bangladesh with a stronger and even more corrupt bureaucracy. They are the only ones who, in the midst of all these scarcities, smoke expensive foreign cigarettes, wear expensive dresses and dine on expensive, imported foodstuffs.

The following description of a sympathetic western journalist confirms the present miscrable conditions in Bangladesh "Even though practically every inch of land is used to cultivate rice or jute, Banglaesh has a foodgrain deficit of more than a million tons a year and has to import 10 per cent of its food needs. Without nearly $1 billion of foreign aid each year the economy would collapse. Bangladesh needs $1.3 billion worth of goods merely to keep it going, but its own exports have not reached $550 million a year. More than 80 per cent of the exporters are accounted for by jute, a commodity that is being displaced by synthetics in world markets. There is no other readily viable export in sight. Independence in 1971 brought euphoria and billions of dollars of aid from East and West, but little progress. Exports have not returned to the level of 1969-70, when Bangladesh was part of Pakistan. Per capita income is still below 1970 in real terms, and food consumption has fallen from a pitifully low 17.1 ounces to 15.5 ounces per person daily last year. Calorie intake has fallen to 2090, only 93 per cent of needs for health, and 60 per cent of families are below this level", (*The Washington Post*, Washington, September 3, 1978).

The future looks as uncertain from the vantage point of 1978 as it did in 1972 and the auspices not a whit less sinister. Political stability, economic security, cultural independence, educational progress, seem farther away than ever they were during the twenty-four years of Pakistan. "Bangladesh is heading for the kind of nightmare poverty that the western press has so often written about. For the lucky West it would only be a nightmare. The Bangladeshis... would have to live— or die— through it", *(Ibid)*. According to some senior Bangladeshi civil servants "Time is fast running out.... There may be as much as five years left or as little as two if the weather turns against the country", *(Ibid)*.

And that in sum is a measure of the achievement of those who succeeded in dismembering Pakistan to the perhaps irreversible loss of the Muslims of the subcontinent, a legacy for which they shall be cursed by all succeeding generations with the master juggler Mujib cast for ever in the role of Mir Jafar.Thus, in the final analysis, Mujib's lasting contribution may be in the field of linguistics: his name a synonym for treachery.

Source :

Matiur Rahman (ed) *Second thought on Bangladesh*, London, 1979.

পরিশিষ্ট : ৯

INDIA, WEST BENGAL AND EAST BENGAL
by Nirad C. Chaudhri

I did not send any commentaries for some weeks because I felt I could not say what I wanted to say on the subject on which my readers would expect me to write, namely, the awful tragedy in East Bengal. Passions were bound to be far too inflamed for anybody to listen to anything put before them calmly. I do not think that even now those passions have died down. That is not our way, for we have a fatal propensity to nurse our passions vicariously, and an ingrained reluctance to view our defeats or failures objectively with a view to avoiding their repetition in the future and redressing their consequences. So, waiting for the restoration of a rational frame of mind would mean for me not writing at all.

I would repeat that the calamity, was avoidable. I have already had a letter from Calcutta in which the writer said that it was not because whatever compromise Sheikh Mujibur Rahman might have been ready for, the Pakistan Government had decided on taking ruthless military action and would have found a pretext for it. Now, this is the typical fatalistic Bengali apologia for justifying mistakes. If that were so, why should President Yahya Khan have come to Dacca at all on the 15th ? By that date a political situation had been created in East Bengal which was like any recognized in history as rebellion or secession by a part of a state against its central authority. It was worse than what existed in the United States when the bombardment of Fort Sumter began the American Civil War. From the 2nd of March onwards civil Government in East Bengal had been seized by the Sheikh and his party with the co-operation of the Bengali civil administration, and there was a de facto secession. The Central Government could have begun military action from any day after, say, the 6th. On the 23rd March, Maulvi Masihur Rahman, the General Secretary of the National Awami Party, said in public speech that East Bengal was already independent and the people would preserve their independence at all costs. He also added "The

people have received orders from the Army and the Awami League and they chose to ignore the Army" So, if military action had to be taken, there was no need to wait for a breakdown of the talks between Yahya Khan and the Sheikh.

I know what answer will be given to this contention of mine-that Yahya Khan made a pretence of conciliation to put the Awami League in the wrong. If that was the manoeuvre why did not the Sheikh take Yahya Khan at his word and accept any of the following conditions ? I put them in an ascending order of apparent defeat

1. Agreed to go to the constituent Assembly on the basis of a qualified acceptance of his four points;
2. Agreed to go to Assembly unconditionally;
3. Even to have restored civil Government to the Central Government and agreed to continue the military regime for the time being.

Would submission to West Pakistan on any of these conditions have involved worse consequences than what resulted from heading towards a collision ? I put a second question Would such submission have been worse than the acceptance of the Allied condition by Germany in two World Wars, and by Japan in the second ? Yet both Germany and Japan have not only recovered from the ruin and humiliation of the second war, they are now economically the two foremost nations of the world with a level of national prosperity unsurpassed anywhee in the world. They are not also politically dependent.

The fact of the matter is that East Bengal Muslims and their leaders did not know the basic principle of seeking or continuing a political conflict when faced with an overwhelming military superiority of the opponent. Yet this is an elementary lesson to be learnt from all history, and the principle is that no military conflict should be sought or continued when it loses all rational character and becomes a gamble, and furthermore threatens the existence of a people. In such situations all responsible political and military leaders say that they would not agree to the death of even one soldier or citizen.

The Muslims of East Bengal did not know the nature of military violence, and did not believe, that it would be applied. They judged wrongly from the analogy of the nationalist Hindu Bengalis and the British. They never anticipated that military force would be brought to bear on a political movement. In any case, they were misled by the behaviour of the British Government of India towards the Hindu nationalists. The Bengali people have not seen any military operations since the raids of the Bargis in the middle of the eighteenth century, while

the UP knew what such operations could be like from the great sepoy Rebellion. In recent times troops were deployed twice in Bengal to counteract the revolutionary movement once from 1914 to 1915, when a platoon or two of the 94th Punjab Regiment and the 16th Rajputs were stationed in my native town, Kishorganj; and again in 1932 when about five brigades of troops were posted in the different districts of the province. They were sent only to boost morale and to show what the ultimate sanction behind the Government was. They were never employed to carry out any operations but route matches. Even for rounding up the raiders of the armoury at Chittagong only a detachment of the Eastern Frontier Rifles, a paramilitary police force, was sent for a few days from Calcutta. These operations, the Bengali nationalists represented as military reprssion. The East Bengal Muslims were clearly deceived by such precedents into thinking that the militry measures against them would be of that kind.

Next, I shal raise another issue which applies both to the past and the future. One of the extra ordlinary features of the Bengali Hindu character is that if is wishes for ** ardently, it also wants to realize it at once and cannot wait. It ** between fits of excitement and fits of gloom. Unfortunately, this peculiarility of the Bengali Hindu intelligentsia was taken over by new ** intelligentsia of East Bengal, though by stock they belonged to more robust type. In other words, in becoming politically conscious the Bengali Muslim approximated to the Hindu type. But being without the experience of political agitation of the Hindu Bengali he did not know where to stop, recognizing the limits of the agitational method. Taken as pure resentment, the grievances of the West Bengal Hindu against the Central Government of India have not been less sharply felt than those of the East Bengal Muslim against the Central Government of Pakistan. Yet the aggrieved Hindu Bengalis have seen two Governments enjoying their electoral and moral support dismissed by the Centre without rising in rebellion. The very newness and inconvenience of the Muslim intelligentsia of East Bengal has been a factor in their ruin.

This fills me with immeasurable grief. I am now engaged in writing a book in Bengali which I shall call *Atmaghati Bangali*, "The suicidal Bengali" in which I shall try to show that everything done by Bengalis since 1920 in politics, in economics, in social life, and in cultural activities has been the reverse of what would have maintained the greatness of Bengal and prevented the eclipse and decline of the Bengali Hindus. In my autobiography, in a passage written in the middle of 1947, I said "All that we have learnt, all that we have acquired, and all

that we have prized is threatened with extinction. We donot know how the end will come, whether through a cataclysmic holocaust or slow putrid decay. But regarding the eventual extinction there does not seem to be any uncertainty". I have now seen that for us Hindu Bengalis the lot is putrid decay. But I thought a stronger, simpler, and more vital Bengali will emerge among the Muslims of East Bengal. They, too; have caught the disease of the Hindu Bengali, but not with their incapacity for action; retaining some of the vitality which their basically peasant descent gave them, they acted with fatal misjudgment and invited a cataclysmic holocaust. Nonetheless, I still think that there is a way of recovery, if only they will be strong and patient enough in their present sorrowful predicament.

As soon as the West Pakistan army went into action the duty of the outside world, and more especially of West Bengal, became plain. It was to do nothing to aggravate the suffering of the Bengalis of East Bengal by encouraging the hopeless resistance and provoking the Central Government of Pakistan. Today the duty of relieving the suffering of those unfortunate people is equally evident. But, in actual fact, what was done was the opposite of what should have been done and what is being done is the reverse of what it should be.

Let me first of all take the attitude of the Government of India, noting only the most formal expression of its views. On March 30, the Indian parliament passed a resolution unanimously on the proposal of the Prime Minister herelf that "the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph", and went on to call upon peoples and Governments throughout the world to take urgent and constructive steps to prevail upon Pakistan to end immediately the systematic decimation of people which amounts to genocide. Mrs Gandhi said to the cheers of her hearers that Indians could not remain indifferent to the macabre tragedy being enacted close to their border.

Today there seems to be a complete retreat from both the ideas- that of a triumphant (or, for that matter, any) resistance on the part of the Bengalis of East Bengal, and of the sympathetic involvement of India in the fate of those people. On May 3 both the *Times* and the *Daily Telegraph* published a summary of an editorial in the *Hindustan Times* in which the paper criticised the Indian Press for lack of realism in giving an idea that there had been extensive and serious fighting in East Bengal. Some passages from it were quoted verbatim, and I reproduce one :"Credibility is vital. It is this that has been damaged by the unfortuante lack of professionalism displayed by the Indian print and sound media in their coverage of the

fighting in Bangladesh". I must say that though the editorial appeared to be sensible I was very much surprised by its publication at this particular juncture. I can hardly help feeling that there was inspiration behind it. I wonder what the paper's own record in reporting those events was.

Next, there is the news that India has asked the U.N. to take over the financial responsibility for the relief of the refugees from East Bengal. On April 4 Mrs Gandhi told the All India Congress Committee that India could not remain a silent spectator of the events in East Pakistan, but it would appear that India would not mind remaining a financially uncommitted spectator of the sufferings of the Bengali Muslims. There was no obligation to proclaim any solidarity with the Muslims of East Bengal at any time, but once recognised it should have been shown in word and deed all through.

No wonder then that even the British newspaper correspondents who during the troubles took up an extremely partisan attitude against Pakistan are now turning equally against India. For instance, Mr David Loshak the representative of the *Daily Telegraph* in New Delhi, made the following remark about the Indian attitude

> "India can see only good in the dismemberment or permanent enfeeblement of its chief antagonist. It is this, rather than concern for the fate of innocent people, that lies behind India's propaganda war on behalf of Bangladesh.

Mr Loshak wrote with a more decidedly cynical air of superiority of the diplomatic wrangles between the two countries

> "I regularly saw spokesmen on both sides. One of the most striking things about them was the inordinate amount of simple glee they got out of revelling in some petty discomfiture of the other side... The "clever-clever" officials of India and Pakistan, basking in their own ingenuity,' would have been stunned if they knew what diplomats of other countries had to say privately about them."

I only wish that the foreign correspondents when they were reporting the actual events were as realistic and cynical.

The attitude of the Government of India over this colossal tragedy was and remains opportunistic, and a pettifogging exercise of realpolitik. But not to the attitude of the Hindu Bengalis of West Bengal. There can be no question that there was, and is, both sincerity and depth in their feelings, but these feelings in themselves were so wrong and their expression so misguided that everything done, said, or believed under their influence has amounted to a curel mockery of the sufferings of the Bengali Muslims, and provided disquieting portents for their own future.

In all this behaviour I see another and the latest expression of the defeatism of the Bengali Hindu both at its most generous and most repulsive. The generous aspect was that the Bengali Hindu who had lost all hopes of doing anything for himself, felt elated that Muslim fellow-Bengalis were asserting their nationalism with such strength and courage. To illustrate this mood, I quote in translation, of course, from three letters I received last month. The first, written on April 1, was from a young and unmarried Bengali girl. She wrote

> "I am pained to see how misled the youth of West Bengal are because I am also one of them. If only we had a leader like Mujibur Rahman, perhaps we, too, should have been capable of crying out 'Jay Bangla' in one voice. It will do us good if from the unconquerable and heroic young people of East Bengal we learn what patriotism is. How many on this side of Bengal have felt for the Bengali language and Bengal in that way ? All of us here tune in to their Radio and listen eagerly. If they win we also shall recover.

The second letter was from an elderly friend who, like me, comes from Mymensingh. He wrote on April 12

> "I shall never again see the land which exists in our dreams as the daughter of the rivers. But praised be the Muslim Bengali brothers. Once they gave their lives for the Bengali language, now they are sacrificing themselves in thousands for their country. This inexhaustible mental strength will not be crushed by guns.

The third letter was from a married woman in Calcutta, and written on April 18. She wrote

> "My mind is so distracted that I cannot sit down to write calmly to you. Our foreign friends cannot understand why we are so moved about East Bengal; why listening to the radio and reading the news in the security of Calcutta, we cannot check our tears, or swallow our food, or attend to business. I have just returned from the house of the Deputy High Commissioner of Pakistan. They raised the flag of Bengal on the High Commission building today, and as soon as we heard of it my husband and I went to see Hossein Ali. I handed him a bouquet and said that it was no time for offering congratulations, these flowers were only in rememberance of the martyrs of his country.

My feeling at reading these letters was one of pained astonishment at the ignorance and capacity of nursing illusions. I replied to all three telling them that their idea of what had happened was not true. Even here in a quiet Oxfordshire village a more horrifyingly correct idea of the reality came to me through the TV.

Thinking of the kind of emotional reaction typified by these letters I could only say to myself that Hindu Bengalis have read their *Ananda Math* all wrong, and utterly failed to grasp its moral. In the last scene, standing on the battlefield on which the dead of his defeated army lie all around, Satyananda cries out to the Physician "I do not seek knowledge. I shall continue the task to which I have set myself. I shall make the motherland put forth corn by drenching it with the blood of the enemy. If I fail in strength, I shall at least die fighting." The Physician replies : "Die ? In ignorance ?" and leads him away. But the defeat irredeemable, and so Bankim Chandra wrote "Farewell led away Inauguration" The supreme tragedy of Bengali life seems to be that there will be no beginning which will not be belighted untimely by our pitiful weakness.

This however, is putting the Hindu Bengali's reaction to the tragedy in East Bengal at its best. Of its rancorous aspect, it is impossible to write or speak with patience. It is repulsive and frightening in every way. First, it is an expression of hatred for Pakistan, not love for the Bengali Muslim. I know the history of the relations between the Bengali Hindus and Muslims from 1905 to today fairly well and untill their opposition to West Pakistan brought about a revision of attitude, never did I see any disposition on the part of the Bengali Hindu to look upon Musim Bengalis as brothers. It is necessary to point out that the partition of Bengal was made possible by the vote of the Hindu Bengalis, and not by any action on the part of the British Government of the day, the Congress leaders, or the Muslims. The express condition for partition was that the Bengal legislature should accept it by a majority, and that a majority was provided by a solid vote of the caste Hindu members and a majority of the Scheduled caste members. Sarat Chandra Bose who opposed the partition was slandered in the most shameful manner. Even after the partition the animosity continued in both Bengals.

Next, the whole reaction is vicarious. One may regret hatred as a motive power in politics. Nazism in Germany, for instanc was a product of many hatreds. But at all events it showed itself capable of efficient and even demoniace action. By that positive action it burnt itself out, and though it inflicted immense harm for the time being on the Germans, it also left them free for their subsequent effort at recovery, which they have achieved in a spectacular manner. But a hatred which is only vicariously indulged, enfeebles the will, and makes a nation incapable of positive effort. It becomes cruel and sadistic as well when it seeks to slake its thirst by gloating on the suffering of others.

I am shocked to see this egoistic reaction even in the Bengali Muslim in England. Among other things, I have seen them demonstrating with excited gestures and cries against the Pakistan cricket team on the TV. I have all the time asked myself how they were able to behave in this manner. Did they not have relatives in Bengal, who had perhaps died or at all events were in distress, and did not that thought weigh them down with grief ? I would say that had I been in their position I should have left England and gone to East Bengal to do any good I could and in any case, to share their sufferings and risks. I would not have indulged my hatred in safety.

Lastly, I would say that the reaction of the Hindu Bengali is frightening in its demonstration of his capacity for self-deception. It should have been obvious to all outsiders that no organised resistance, not to speak of success, was possible against the military forces of Pakistan. The only rational argument the believers in resistance could produce was based on the number of Muslim Bengalis. This rather reminded me of what Attila the Hun said when he ws threatened with desperation of the whole starving population of Rome at the time he was besieging the city. "The thicker the hay, the easier to mow", he said derisively. And numbers have become even more insignificant in the face of modern arms and armies.

But the real point is that a people who can fail to see realities as the Bengali Hindus did in the case of the events in East Bengal, will not even see their own predicament for what it is. Action for them will always be an escape from the problems set by ife, and never result in their solution. This terrible failing I have seen in my fellow-Bengalis all my life, and I am seeing it continuing in everything.

The Hindusthan Standard, Calcutta, May 10, 1971.

Source : Matiur Rahman (ed) Second *Thoughts on Bangladesh*, London, 1979.

পরিশিষ্ট : ১০

Nationalism or Islam

Before we came out of prison, we all had taken a solemn oath to work for the cause for which we suffered so much. We were

lucky to be alive but many of our compatriots had already joined the galaxy of free souls in the world hereafter for the same cause. We did not allow ourselves to be cowed down by the new national upsurge rather we vowed to serve a cause greater than territorial nationalism. A cause which Allah had asked man to serve— for salvation of man in general and for the faithful in particular. To us Pakistan was not merely our political entity but a cause which was confined to a definite territory. Muslims who never belonged to or even have visited the holy places of Mecca and Medina still feel and rightly that there is their spiritual home. And Pakistan was established for the very cause where Muslims could ordain their lives freely on the tenets of Islam. For the cause Pakistan, so long continues to nourish or preserve it, will always be a homeland for the Muslims whether they physically live there or not. Again Bangadesh, if can nourish or preserve the same cause—90% of its people being Muslims may make it acceptable to them as their own home land both physically and ideologically. But not otherwise. Muslims all over the world should also shape in the same way wherever they live.

When I resumed my practice after 2 years I found that most of my briefs were either taken away by juniors or clients. But some clients did not want to leave me. And they said that they would not leave me till my last breath. Some even paid fees to my family secretly in those difficult days of life and death. Many of the civil cases, of course, did not need any attention during two years as their judicial disposal was practically nil.

Moreover, Mujib kept no High Court running and when it was reconstituted with his chosen men as judges it was just a names sake with a new constitutional juglery of rolling both High Court and Supreme Court into one. He even admonished his own appointed judges to behave which meant that they must toe his line and not the line of justice. Even the hand picked judges could not be devoid of conscience. And when I began to appear again before them in 1974 on civil matters— old and new, criminal matters mostly defending the alleged collaborators and constitutional matters, whatever was left of it, I found under their show of sound and fury a profound sense of justice. I wish I could compliment them all. One really could not blame them as everyone could not rise above the environment of crude injustice and lawlessness which was prevailing in the country at the behest of the party in power. All were under the bondage as the whole country was a prison house.

Besides a Awami League, a Communist paty, two National Awami Parties, a National Socialist Party (JSD), and a few more political parties were functioning in the country in the name of democracy. But democracy was the worst victim in the hands of

their protagonist. Socialism was the order of the government under the patronage of Russia and India. But pro-Chinese or third international socialists in spite of foreign backing were either being physically eliminated or thrown behind prison. Pro-Moscow groups were having their hey days politically, culturally and even financially.

A time had already come when we 'collaborators' were no longer publicly condemned rather respected. The official groups were not only criticized but hunted out by the armed supporters of anti-govt. groups and physically eliminated in broad daylight. Those who mercilessly butchered the pro-Pakistani elements were being publicly executed by new elements with the support of the people. With arms in everyone's hand the secret killing was no longer onesided monopoly of the government supporters rather it had permeated into everyone's blood for political or personal causes. Though not a full scale civil war was raging the country but it surely was taking no less a toll of life than 1971. On the other hand the economic condition of the country was going from bad to worse despite the massive relief operations of national and international organizations including that of International Red Cross and United Nations. The country proved to be a bottomless bread basket. Only the high cadres of pro-government parties were basking under the sun of affluence though famine had started in the countryside taking heavy tolls. Village people who with high hopes voted blindly in favor of Awami League were now crowding the streets of Dacca to get some work or dole but in vain. The healthy men and women of Pakistan had all turned into bony ill-nourished rickets; traversing the roads of Bangladesh for a morsel of food or a piece of cloth. They even looked worse than the *Biharis* who were reduced into homeless paupers by the new nation.

The proceedings of one of our secret cell meetings, where a proposal for lending strategic cooperation to Mujib regime was turned down, reached the press and authority. The result was inevitable. Some of our colleagues were taken to custody again throwing the rest underground. At this time the pro-Chinese nationalist groups working both overboard and underboard got very close to us. We had the support of the people and they had the strength. So all their top ones wanted our cooperation to overthrow Mujib. Even some groups within the armed forces were also prepaed to bring us back to the fore to save the country. Trained in democracy we could not rely upon such short cut. The issue before us was not to capture power. If we wished it was not beyond our reach in 1974 but the outcome

would be more uncertain. It was necessary to prepare the society of the people for the state to be. The state that was there was nothing more than an apology for it.

Repression of the people and gagging their free opinion was not peculiar in Bangladesh alone. Dictatorial overtures were visible in West Pakistan also. Bhutto as prime minister under the cover of emergency was consolidating his own position rather than of his party. The victims were the leaders of Muslim League, Jamaate Islam and National Awami Party...

Some of my friends in West really offered me and my family all help and support that I would need. But those in office were busy with their own affairs so did not have time to help our fellow victims in Bangladesh. So I could not convince myself of accepting any favour from anyone. For the sacrifice our people made for the cause of Islam we are glad that no material help belittled their position. Bhutto helped only some of those who physically were present in West. Yet when Bhutto came to Dacca in 1974 he got a hero's welcome to the utter astonishment of Mujib. It was a real people's welcome on his first visit to Bangladesh. That was just a glimpse of the people's return to our fold. Bangladesh ministers were jeered and insulted. Bhutto and his associates were given an unprecedented ovation of welcome. It seemed to be a reversal of the celebration of December 16, 1971 rather restoration of the spirit of 1947. Both Bhutto and Mujib compared their notes of success. They both got what they wanted— to rule all that they could survey, but people remained deprived.

This visit normalized the relations between the two countries and ultimately helped us bringing Bangladesh to the forum of Islamic Summit Conference in Lahore. After Rabat this was the most important conference of over 35 Muslim states of the world which the various heads of the state including King Faisal of Saudi Arabia and Col. Gaddafi of Libya attended.

Various positive decisions were taken in Lahore for the consolidation of the Muslim world. Mujib for the first time identified himself with it despite his concept of secularism. But nothing could restore confidence of the people in him any longer. He was rather being looked upon as the champion of betrayal of both Bengali and Islamic interests at the dictate of his masters. His demagogy, his popular trick, his patronage of devotees and even the gestapo type *Rakhi Bahini* were no more sure to keep him to power. A time had come when he must repay for his sins in this world but none knew how. He was sure to follow the historical path of the oppressors but no one knew when. The praying hands of the oppressed, the unfed, the unclad, the shelterless, the jobless, the deprived and the pious have all gone

up in unison calling for an end to his corrupt slave rule. None can defeat the power of genuine prayers of the oppressed.*

'Secularism' as an antidote to religion and a nursing ground for communism was accepted as a pillar of Bangladesh Constitution. The 99% popuation of the country will one day find it contrary to their aspirations and beliefs— be he a Muslim, Hindu, Christan or Buddhist. Even India's constitution does not recognise secularism as state principle. It may only be a policy of some government.

Socialism, another pronounced constitutional principle of Bangladesh again may be a policy of some government. But to say it is a constitutional obligation of Bangladesh had already ruined the entire agricultural and industrial fabric of the country. The economy of stae owned industries were all on the verge of collapse. The employer state and working labourers were all on point of starvation after the initial jubilation. The welfare economy of Pakistan days was now being remembered as golden means.

The last of the 4 principles of the one party constitution, 'democracy', never had so deplorable a fate in Indo-Pak subcontinent since 1947. The country was leading towards the one party rule of a sole dictator full of vices and corruption.

The people were again thinking of real independence from the twin clutches of foreign domination and internal exploitation. Even in Pakistan the people were not so anti-Indian as they turned out to be in Bangladesh by 1974. The government seemed to represent the interests of its mentors in form of 25 years treaty, Farakka sellout and smuggling across the borders. The infiltration in the fields of trade, culture, educaton and industry seemed to be too irritating for the people.

So Bangladesh was faced with two alternatives. She has to struggle for real independence of Bengali nation which lies in the territories of East Bengal, West Bengal and Assam. Thereby she can become a state not to be dictated by her neighbour politically and also become a formidable economic power of agricultural and industrial potential. The componencts can well form a federation of their own choice as Bengal or Bangassam. Alternatively by the history and culture of 90% population of Bangladesh i.e. Muslims, it should become another homeland for the Muslims— Muslim Bengal. The state principles of secularism and socialism do not fit in with the aspirations of the people. Once Bangladesh declares itself as a Muslim state its oneness with the Muslim world will be identified to steer clear of

---

* Mujib was killed by his own revolutionary army on August 15, 1975 two years after this writing.

many of its inborn problems. Mujib may come and Mujib may go but people of Bengal will remain there to lead their chosen way of life whether its present allies or masters allow such a thing to take place or not. Only people can do that by any recognised method of taking over the rein of state for that cause.

As to India itself the people must one day get rid of the still predominant caste system of human insult. This they can do by either accepting Islam as a code of life or humanising the entire social pattern. The minority Muslims or untouchables there should no longer be the victims of communal appartheid or genocide. Otherwise they have to claim another separate homeland for themselves in India.

A great resurgence of people's awakening in Bangladesh became evident in all walks of life through the efforts of our people. The Ulema, the custodian of Islamic and Arabic knowledge and tradition, once again became the vanguard of this awakening like the dark days of British rule. Their educational institutions, madrasahs, highly patronized during our time, became known as enemy centres with the creation of Bangladesh. Thus they were first discontinued by the government but gradually came to life by voluntary initiatives. The great such centres of learning in Kishoreganj, Hathazari, Sarsina and Dacca again pulsated with life. Religious gatherings and prayer meetings became a popular event in rural and urban life. The meetings, strikes and demonstrations in political, labour and student fields to rid the country of the bondage could no longer be controlled by the government.

Two years of captivity had ended but it left me twenty years older both mentally and physically. My hairs had gone grey and I was feeling a disgust for politics. My mind was looking for something higher— much higher than what my environment could offer. I did not know exactly what it was. So I began to have reflections of what I had seen and what I would like to see.

The most important subject for reflection was the nationalism— Indian, Pakistani, Bengali, Muslim or else. Geographically by birth Bengal was a part of India so I had Indian nationality like 40 crores more under British Commonwealth. But in 1947 that part of Bengal became Pakistan by choice of votes recorded by a period of struggle for national independence. Bengal gave 90% votes in favour of Pakistan more than any other parts of Pakistan. So one can safely say that Bengalis became Pakistanis by its own free will. Added with it was a part of Assam— Sylhet district, who also cast similar percentage of vote in a separate referendum held for

ascertaining their will like North West Frontier Province. If referendum was held as promised and agreed, Kashmir would also have opted for Pakistan nationalism. Yet thereafter hundreds of thousands of Muslims from India migrated to Pakistan on their own choice leaving their old hearth and home. And so did some Sikhs and Hindus from Pakistan to India.

Thus at great pains and sacrifice two nations were born and people found their geographical footing with defined territory, government and sovereignty. For any new born or old states or for their people in the name of citizenship, defending their territory more than any thing else, become an act of duty, patriotism and honour. One need not raise his little finger if human rights and values are trampled under its feet within or across its fronitier. One is not even obliged to help his fellow beings if the other suffers in disease or hunger. One need not physically protest if the honour of a mother or sister is defiled by its own whims.

One is even more helpless against any political repression or economic exploitation done in the name of nationalism. Even if the Almighty creator is disowned or defamed it becomes a permissible affair in monolithic states and a personal matter in democratic countries.

Wars were fought for mere territorial integrity— which territory remains changing every now and then. And valuable lives and properties are sacrificed in its euology. If three wars were fought between Pakistan and India hundreds have been fought between other countries of Asia, Africa, Europe and America. The more old the civilizaton of a country the more number of wars go to its credit. The two devastating world wars were fought for pride and prejudices of nationalism. So we have been fighting for ages for ever changing, transient, short lived territorial intergrity. In the modern times this integrity has taken shelter under nationalism whereas in earlier times it was under various other pursuits of pomp, power or valour. Not many wars were fought for noble and just causes.

Only within 25 years of the creation of Pakistan another nationalistic spirit came forward burying all the emotional and physical sacrifices of 1947, giving birth to Bengali nationalism in the desecration of their cause for Pakistan in 1971. The very soldiers and people who fought for the defence of Pakistan on the borders of West Pakistan in 1965 did everything possible to undo Pakistan for their newly discovered nationalistic spirits. Within such a short period the values of nationalism had changed which called for a sacrifice of innumerable lives on either side. More surprisingly even this Bengali nationalism was on the wane when I was free from its clutches only in 1973. It

did not take even three years for the people to have a second thought.

The concept of geographical nationalism is not of very recent growth but it came to its full bloom after the industrial revolution. The heroes of Carthage, Rome or Greek history were imbued more with the desire for personal pomp or power rallying the vested interests behind them, whether salves or free men. The Persian, the Byzantine and the Moghul conquerers also followed the pattern of personal or ethnic characterization of power or glory without any definite geographical frontiers. The colonization of the Portugese, Dutch, French, Spanish and British nations served the interests of the rulers only at the cost of their colonies. As against this the colonial people also rose to national consciousness for their struggle for survival. 'My nation right or wrong' became the theme both of international exploitation and national suppression of fundamental rights.

After the decline of the Papal authority of Rome the Protestant movement gained support from geographical entities in Europe. Loyalty to a homogenous authority was divided and sub-divided in this process creating sense of close geographical entities wedded to spiritual values in some and secular belief in others. It was the consolidation of nationalism in Europe to counter the vices of Papal authority. The Crusade between the Cross and the Crescent having ended Europe was left with no cementing force to keep the different linguistic, ethnic or cultural entities to live under common domination. Whetever spiritual attachment was left to such national states, it gradually gave in to the newly found secular beliefs. Gradually those secular states stepped towards a social revolution leter identified with democratic socialism or totaliarian communism.

Theoretically socialism negates geographical nationalism. But both democratic and socialist states being secular in nature ended in the eulogy and defense of geographical nationalism. Every one spoke of freedom, liberty and economic benefit of its own people but the welfare of mankind as a whole was never given the due recognition in this ambivalence. The Arabian and Moorish intellectual activity radiated from Mecca, Medina, Baghdad, Cairo and Cordova influenced the western world up to sixteenth century but its reversal took place thereafter in the eastern world including Muslim countries of Asia and Africa. Thus the secular and socialist belief occupied the intellectual field in East giving rise to similar nationalist aspirations— ethnic, linguistic or geographical, giving up its own ways of governing system. The two world wars have demonstrated the ugly faces of such national states and their prejudices in the 20th century. The post war periods have shown urgency or

importance of international homogeniety for human survival. The human effort reflected through the League of Nations or United Nations only evidenced the higher aspiration of human existence. But the basic mistake of accepting national sovereignties as the foundation of such international bodies led them nowhere but to a state of war or cold war between the national states or their camps. The spirit of Ghengiz Khan was refined by Hitler and the spirit of imperialism was refined by communism but none came up with the message of liberation of mankind as a whole for its physical and metaphysical existence as Islam did. Thus the salvation of man through love and peace remained a far cry in a world of hundred and odd national states of modern times.

The reaction to the western philosophy of imperialism or communism mildly filtered through the concepts of democracy or socialism has been one of passive acceptance in the east. The eastern style of existence through spiritual superiority over the material existence was already over shadowed by the superior material power of the wetern world. The radle of civilization, from where all the monotheistic creligions like Judaism, Christianity, Buddhism or Islam originated, was practically under the subjugation of the western power or thought. The superior domination of the west well before the end of world wars had occupied the eastern world not only economically or politically but also by education and thoughts. Thus Kamal Pasha of Turkey, Reza Pehlavi of Iran and King Farouk of Egupt though were Muslim rulers were fully under the influence of the western thoughts of nationalism and materialism. Even Tojo of Japan, Chiang Kaishek of China, Gandhi of India and the leaders of Afro-Asian countries consiously or uncounsciously were subscribing to the western ideas of nationalistic thoughts.

Communism in Russia and China has influenced various western and eastern countries and their people enormously as an idealistic force of social revolution. Never-the-less Russia remains a monolithic state of uncompromising nationalism and so are other such communist states of west or est. In spite of the strong Marxist doctrine neither the state nor money has withered away in Russia China, Yogoslavia or any of its camp followers. Rather nationalism has taken deeper roots there like the U.S.A., U.K., France, Germany, India or Pakistan.

After all the sovereignty which becomes the inalienable right of every natonal state really does not belong to it. None of the theories of sovereignty is fool proof whether it is the "divine origin" theory for the protection of the King or any ruler, "organic" in its functions, "social contract" in its development, "pluralist" in the modern sense or even "peoples" in the marxist

pattern; they do not reflect the real sovereignty. If the states were really sovereign how one could fight another. They must be parallel sovereign or mini sovereign or no sovereign. Sovereign is one who owes nothing to anyone else, everythin must be subservient to the soverign, he must be the cause of all causes, the *causa sui* or *summum bonum* and the source of all powers. No human being or any of its institutions national or international can really claim to be sovereign. It is only Him and nobody else who is Sovereign. And man can lead a life of peace and prosperity not in mutual conflicts or chaos but in the discipline of the cosmos.

So the root of these conflicts i.e. national sovereignties, must be surrendered first to a supernational organ consisting of all the global units of administration. The states must remain subordinate non-sovereign to a super state of all mankind. This super organ should no longer recognize or guarantee the national sovereignty. Rather it should stand as the vice regent of the real Sovereign committed to abide by the rules and morals of the Sovereign for the welfare of mankind. If the United Nations can fulfill this obligation by changing its basic concept, there is nothing wrong in it. But it seems that a new world order of divine law has to emerge where God is supreme; not people, wealth nor might of any individual or nation.

Divine law is again necessary to guide the world order as no human law— old or new, has ever proved to be infallible or all pervading. Many cannot see what is beyond the walls so how can he determine laws good for eternity. Since man is confined in time and space his wisdom of natural or social science is also limited. So obedience to Divine law will lead us to avoid the conflicts of national or human laws. Natural question will arise what divine or religious law should be followed. Were there no wars on religious grounds ? Yes, But "there is no compulsion in religion; righteousness is distinct from evil".— Holy Quran, 2 : 256.

The main purpose and function of the world body should be to do away with the concept of war as a means of settling disputes of any kind. Once that can be done all the wepons or potentials of war will have to be eliminated. What remains thereafter is only reasoning and persuasion to adopt divine laws. We have to find answers of world peace in this and not in superior weapons or state sovereignty.

While our people remain unfed, unclad, or distressed the war preparations of all ages including the modern thermo-nuclear arms race consume the most vital portion of world wealth for human destruction. Sense of national pride or superiority in the name of its people makes its men, women and children to suffer the ignominous results of war or brink of war—

economically, socially and morally. This colossal wastage can be diverted for all round progress and happiness of man all over the world. The animality in man can be harnessed if its destructive qualities are channelized for human wellbeing. It is high time for the superior reasoning and power to take control of the ever worsening situation before we find ourselves engrossed in another world conflagration. Thermo-nuclear war with any amount of preparedness will leave us none to enjoy the fruits of victory. So it is time to work out world order of peace, not in words but in deeds. Instead of becoming heroes of national sovereignties causing boodshed everywhere let us be the citizens of one world government of love and peace.

The Islamic concepts of state which originated in Medina during the life of the holy Prophet Muhammad (p.u.h.) was carried through the days of the four great Caliphs on the basis of the thoughts enunciated in the holy Quran and Hadith. Though subsequent rulers of Islam did not adhere fully to the concept of Islamic state yet it ruled the field till the days of Crusade. The expansion of Islamic polity in Asia, Africa and Europe was not based on geographical, ethnic, linguistic or any other criteria of western nationalism. Islamic state cannot be confined to any such criterion rather it takes the shape of a global existence. A man is not considered here as an instrument of holding such national values or prejudices rather he will be upholding the spiritual and physical values of dignity of man and his fellow human being primarily responsible to the laws of his creator. The Islamic thinkers like Abu Hanifa, Ibne Sina, Ibn Rushd, Ibn Khaldoun and Al Ghazzali enunciated the principles of Islamic polity in great detail. But the vacuum in the field of physical and social sciences in modern times was not effectively filled up unitil the recent thinkers like Dr. Zaki Nusseibeh of Turkey, Syed Kutub of Egypt, Dr. Iqbal and Moulana Moududi of Pakistan greatly contributed in this realm of political challenge of the modern world.

The challenge of the western concepts of democracy or socialism manifested in national conquest and glory is well answered in the fundamental principles of Islam though not well practiced by all Muslim countries of the world. Instead of implementing the state principles of Islamic Commonwealth of the people we have developed isolated national states on the basis of territorial or linguistic national sovereignty. In fact no one other than Allah can claim the sovereignty be it the state, the emperor, the priest, or the people. "To Allah belongeth al that is in the heaven and on earth". Holy Quran, 2 : 284.

"The Authority rests with none but Allah. He commands you not to surender to any save Him. This is the right way". Holy Quran, 12 : 40.

The sovereignty belongs to Allah alone and man His supreme creation is only vice regent. Islamic state would be the kingdom of God but not a theocratic state. It is not the priest or the king who runs the state by his superior wisdom or power but the people run it in accordance with the Book of Allah and the guidance of His Prophet; which is neither theocracy nor dictatorship. The limits on the popular will or liberty defined by divine law is only to maintain the ideal balance between human rights and duties. It is the middle course between the extreme of totalitarian and democratic systems in all vital aspects of human life and society.

Life is not merely a pursuit of spiritual aspirations denying material needs. Nor it is a process of continuous strife or class war for material benefits only. Human life consists of personal and collective efforts through faith, reason, love, devotion, respect and cooperation for material and spiritual ends. Both the ends and means must be justified that is why greed, hatred, jealousy, lie, oppression, bloodshed and violation of others rights have been treated as sins in all divine laws. Religion is neither phantom, opium, superstition, rituals, ascetism nor feud. It is rather a complete code of noble human life. That code was only perfected in Islam.

"This day I have perfected your religion for you, completeed My favours on you and have chosen for you Islam as your religion". Holy Quran, 5:4. This divine law has prescribed the universal brotherhood of mankind irrespective of colour, tribe, race, language or nationalism. "O mankind, We created you from a male and female and made you into nations and tribes that you may know each other. Verily, the most honoured of you before Allah is the most righteous of you; surely Allah is Knowing, Aware" Holy Quran, 49 13.

Can we deny our origin in Adam and Eve though we have divided ourselves in Christianity, Judaism, Budhism, Hinduism and Islam ? Can we deny that mankind is one though we belong to democratic, communist or nationalist states of today ? While we suffer from black, white or brown colour complex can we deny that we all are human beings ? While we are either European, American, Asian or African can we deny that without discipline of cosmos we cannot survive however advanced our technology, knowledge or power may be. "Your Allah is one, you are from Adam and Adam was from dust; an Arab has no

superiority over a non-Arab nor white over a black except by righteousness" —Al Hadith. "Mankind is the family of Allah and the most beloved of them before Him is one who is best of His family"— Al Hadith.

So the bloodshed in the name of racialism, atheism or religion must come to an end. Exploitation of capitalism, communism or nationalism must be abrogated. Despite all the conflicting views and systems developed by human genius the concept of universal brotherhood with righteousness under the sovereignty of God must be accepted as supreme law of one World Government. And this we very much owe to the Creator of cosmos and to the mankind for Islam or Peace.

Source Akhtaruddin Ahmad, *Nationalism or Islam*, New Delhi, 1984.

পরিশিষ্ট : ১১

[যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের প্রচারপত্র]

WAR CRIMES TRIALS IN BANGLADESH

The Dictates of
Humanity and Justice

Rev. John Hastings and Rev. John Clapham in a letter to The Guardian, London, 27 May, 1971 :

"Villages have been surrounded, at any time of day or night, and the frightened villagers have fled where they could, or been slaughtered where they have been found, or enticed out to the fields and mown down in heaps. Women have been raped, girls carried off to barracks, unarmed peasants butchered or bayoneted by the thousands.

Tony Clifiton in Newsweek, 2 August, 1971 :

"It seemed a routine enough request. Assembling young men of the village of Haluaghat....., a Pakistan Army Major informed them that his wounded soldiers needed blood. Would they be donors ? The young men lay down on makeshift cots,

needles were inserted into their veins and then slowly the blood was drained out of thier bodies until they died".

Time Magazine, 25 October, 1971 :

"One of the more horrible revelations concerns 563 young Bengali women, some only 18, who have been held captive inside Dacca's dingy military cantonment since the first days of the fighting. Seized form Dacca University and private houses and forced into military brothels, the girls are all three to five months pregnant".

Newsweek, 3 January, 1972 :

"ATROCITIES It may take years, in fact for Bangladesh to recover from the ravages of the past few months. In their campaign to bring the Bengalis to heel, the Pakistanis focused their fury on the elite of Bengali society. (After liberation).... they discovered open graves that contained the bodies of more than 125 of Banglaesh's most influential physicians, professors, journalists, lawyers, all of whom had been tied up and then bayoneted, garotted or shot. And the presumption was widespread that efficient Pakistani assassination teams had committed similar atrocities elsewhere throughout the nation. The whole nation is a mass grave, said one Bangladesh official, 'who knows how many millions they have killed.'"

A Staff Study entitled *The Events in East Pakistan, 1971* by the Secretariat of the International Commission of Jurists, Geneva, highlights the character of the crimes and their legal implications

"An American who was working in a rural area in the interior throughout the period from March to December (1971), has written a powerful indictment of the Pakistan Army and its auxiliaries in these terms :

'For nine months all human rights were completely suspended in East Pakistan, Not only the Government and the Army, but every soldier with a gun had supreme authority over life and death and property and could use that authority at will..... The military eign of terror in East Pakistan was directed almost exclusively against the unarmed civilian population.....The final figures of all this horror, the full extent of the terrorism and of the denial of every human right will probably never be known. A million may have died, or two million, or three.....The exact number is really immaterial. *It is definitely one of the most shameful episodes in the history*

of the human race; and it happened in the enlightened 20th century. And it will happen somewhere again, if the Nations of the World take no steps to prevent it. (P. 26).

"There is hardly a phrase of this Article (Article 3 of the Geneva Conventions, 1949) which does not appear to have been violated on a massive scale by the Pakistani Army and auxiliary forces throughout the period from 25 March to the surrender of the Pakistani forces on 16 December..." (P. 54).

"The massacre of unarmed civilians, the destruction of villages and parts of towns, the rape of women, the torture and intimidation of prisoners, the taking and killing of hostages, the frequent executions without trial, the failure to tend to the sick and wounded, all these, wherever they occured, were inexcusable crime..." (P. 54). (P. 54).

"...there is abundant evidence that war crimes were committed by the Pakistani army and auxiliary forces and that many crimes against humanity were also committed." (. 61).

"The effect of these principles is that the individual officers and soldiers who carried out the 'kill and burn' missions and other crimes under international law are liable to be prosecuted and punished unless there was no moreal choice open to them. Those who ordered the commission of the crimes are liable to prosecution. Equally, those who passed on the orders or who, knowing of these crimes or the orders for them, failed to prevent their being carried out when they had the opportunity to do so, are themselves guilty of 'complicity' in the commission of these crimes." (P. 63).

The Government of Bangladesh is entitled to hold any such trials under domestic law before domestic tribunals..." (P. 63).

The United Nations Human Rights Commission in its 29th Session in Geneva in March 1973 adopted a resolution urging the ultimate adoption by the United Nations General Assembly of a resolution proclaiming the following principles :

"1. War crimes and crimes against humanity whenever or wherever they are committed, shall be subjet to investigation and the persons against whom there is evidence that they have committed such crimes shall be subject to tracing, arrest, trial and, if found guilty, punishment.

4. Persons against whom thee is evidence that they have committed war crimes and crimes against humanity shall be subject to trial and, if found guilty, punishment, as a general rule, in the countries in which they committed those crimes".

Bangladesh has, in these circumstances, a right, and indeed a duty, to try those persons against whom there is evidence that they have committed grave crimes, including genocide, war crimes, crimes against humanity, organised murder, rape and arson.

The thousands of Bangalees who suffered in the torture chambers, the millions of widows and orphans of the victims of the atrocities, indeed al those who have survived, have a right to expect that those responsible for such heinous crimes should not escape justice.

The U.S. Senate Resolution passed in 1943 urging trial of Nazi war criminals stated, *inter alia*, that "the dictates of humanity and hnourable conduct in war *demand* that inexcusable slaughter and mistreatment shall cease.... and that those guilty, directly or indirectly, of these criminal acts shall be hald accountable and punished in a manner commensurate with the offences for which they are responsible." *Congressional Record*, 78 Cong., I Sess., 89; 1723.)

[The United Nations General Assembly by its Resolution 3020 (XXVII) adopted in January 1973 expressed the conviction that the effective punishment of war crimes and crimes against humanity is an important element in preventing such crimes and putting an end to them, as wel as ensuring better protection of human rights and fundamental freedoms and promoting co-operation between peoples and international peace and security.]

The trials which are to be held in Bangladesh will be before a Special Tribunal, consisting of judges having the status of judges of the Supreme Court. The trials will be held in accordance with universally recognised juridical norms. Eminent international jurists willl be invited to observe the trials. The accused will be afforded facilities to arrange for their defence and to engage counsel of their choice, including foreign counsel.

The decision by Bangladesh to try 195 persons against whom evidence of having committed grave crimes exists is a response to the dictates of humanity and justice, and is in discharge of its duty to posterity, as a step which will deter the recurrence of such horrors and atrocities anywhere at any time in the future.

পরিশিষ্ট-১২

কেন্দ্রীয় শান্তি সমিতির সদস্য হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত

শুনেছি ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। কিন্তু আমার ঢোল কে বাজাবে—? তাই আমি একটু বাজাচ্ছি— নতুবা এই কথা গুলি চিরদিন অজানাই থেকে যাবে। এবং আমাকে চিরদিন ভুল বুঝবে। তাই নিম্নলিখিত বর্ণনা করে যাচ্ছি। সঠিক বিচারের ভার সুবিবেচক পাঠকের উপরই রইল।

আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ এবং স্বাধীনতা প্রিয় নেতৃস্থানীয় লোকজন ও যুব সম্প্রদায় প্রায় বেশির ভাগই প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের জন্য সেখানে পরে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের মধ্যে দল ও মত নির্বিশেষে পাক বাহিনীর হাতে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পিস কমিটি বা শান্তি সমিতি গঠিত হলো। দেশে বিরাজমান পাকিস্তান সামরিক শক্তি যারা ইচ্ছামত শাসন-শোষণ ও জুলুম চালাচ্ছে আর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভারতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বিপদ মুক্ত মনে করছেন কিন্তু যে কোন মুহূর্তে পাক বাহিনীর হাতে মৃত্যু হতে পারে জেনেও মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যায়নি বা যেতে পারেনি তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলার কেউই রইল না। সেই অবস্থাতে দেশের জনদরদী নেতৃস্থানীয় লোক মিলে দেশে একটি তৃতীয় ধারা বা শক্তি হিসেবে জনগণকে বাঁচাবার জন্য, শান্তিতে বসবাস করতে পারার জন্য উপরোক্ত শান্তি সমিতি গঠিত হলো।

যে কোন সরকারের সময় কতগুলি লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সরকার পার্টিতে যোগ দেয় এবং তাদের অপকর্মের জন্য জনগণ ও সরকারী পার্টিকে দায়ী করে। দেখা গেছে অতীতে রাজনৈতিক বড় বড় মিছিলের সাথে কিছু সংখ্যক লুটেরা গুণ্ডা যোগ দেয়। এবং ঠিক সময় মতো যান বাহন ও দোকান পাট ভাংচুর ও লুটপাট করে। সেই রূপ ভাবে এই পিস কমিটি বা শান্তি সমিতিতেও যে কিছু লুটেরা পার্টি দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি তা আমি বলব না। এই কমিটির সকল সদস্যই যে ধোয়া তুলসী পাতা ছিল তাও বলা যায় না। কিন্তু পিস কমিটির অধিকাংশই নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করে গেছেন। খুব কম লোকেই দেশের ও দশের অমঙ্গল করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে। জনগণের এই মহাবিপদের সময় যারা জনগণের ক্ষতি করেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুনিয়াতে ও আখেরাতে তারা তাদের ন্যায্য সাজা পাবেনই পাবেন।

কেন্দ্রীয় পিস কমিটি গঠন হওয়ার সময় প্রথম দিকেই আমাকে সামিল হওয়ার জন্য ডাক পড়ল। কিন্তু আমি যোগ দেয়া উচিত কি অনুচিত তা চিন্তা ভাবনা ও ইতস্ততঃ করেছিলাম। এমন সময় স্থানীয় কয়েকজন রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে কেন্দ্রীয় পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে দেশবাসির উপর যে অত্যাচার অবিচার ও জুলুমের বান ডেকেছে— তা আমার এককালের সহকর্মী ও বর্তমান গভর্ণর ও সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের নিকট জানাবার সুযোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তারা আমাকে পিস কমিটিতে যোগ দিয়ে এই মহা সংকটের সময় দেশবাসির খেদমত করলেও স্বাধীনতা উত্তর কালে আমার নিজস্ব বিপদ আপদ ও জেল ফাঁসির ঝুঁকি আছে তাও স্মরণ করে দিলেন। আমি তাদের নাম লিখে তাদের কোন বিপদে ফেলতে চাই না। কিন্তু পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন আমার সামনে তুলে ধরার জন্য আমি তাদের শ্রদ্ধা জানাই। অনিবার্য মৃত্যুর সম্ভাবনা জেনেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। প্রয়োজনে ভারতের স্বাধীনতা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে আনয়নের জন্য জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তাই এ বারও দেশে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের অবর্তমানে দেশবাসিকে এই সংকট মুহূর্তে শান্তি ও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আবারও মৃত্যুর ঝুঁকি নিলাম। আমি তাই কেন্দ্রীয় পিস কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণ করলাম। আমার এক কালের সহকর্মী গভর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ও ১৪ শ ডিভিশন কমান্ডার লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজিকে যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি নিরীহ লোকজনের উপর পাইকারী অত্যাচার, জুলুম ও নরহত্যা রুখতে। এতে কিছু ফলও হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বে-আইনী ভাবে মার্শাল-ল' এর মাধ্যমে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের সিট খালি ঘোষণা করে অমাাকে নির্বাচনে দাঁড় করতে পারেনি। এই অবৈধ ইলেকশনে দাঁড়ানোটাই আমি অন্যায় বলে মনে করেছি। দ্বিতীয়তঃ পাক বাহিনীর জুলুম ও অত্যাচার সমর্থন করে আমাকে দিয়ে পাক সরকার কোন বিবৃতি দেওয়াতে পারেনি। তাদের কোন অন্যায় কাজে আমার সহযোগিতা পায়নি। এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকলে তৎকালীন সরকারী রেকর্ড পত্র ও দৈনিক খবরের কাগজ দেখলে আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।

দেশের সদস্য নির্বাচিত আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা দেশকে কোন যুদ্ধকালীন আত্মরক্ষার পরিকল্পনা না দিয়েই হঠাৎ করে যে যে পথে পেরেছে ভারতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তাই আমরাও নিজের বুদ্ধিমতো যেমন করে হোক মানুষকে বাঁচাবার পরিকল্পনা করেছি। বলা বাহুল্য আমরা স্বদেশে জনগণের মধ্যে থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও জনগণের সেবা করেছি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ ছোট নেতা ও কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে (বড় নেতারা তো ভারতে আশ্রয় নিয়েছে) তাদের সকলকে পিস কমিটির সদস্য করলাম।

কারফিউ পাশ এনে দিলাম, দিন রাত কর্মীরা ডিউটি করে মা বোনদের পাক বাহিনীর জুলুম থেকে ও দোকান পাট ঘর বাড়ি লুঠ থেকে বাঁচালাম। আওয়ামী রীগ কর্মীদের ও সমর্থকদের পাক বাহিনীর অহেতুক নির্যাতন থেকে রক্ষা করলাম। বর্তমান এম-পি হেমায়েতউল্লাহ্ আওরঙ্গ, শেখ মারুফ, (শেখ মনির ছোট ভাই) সহ বহু আওয়ামী লীগ কর্মীকে পাক বাহিনীর হাতে নির্ঘাত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছি। আমার হিজলা থানার ও, সি কে হত্যা করে মুক্তি বাহিনী থানা লুঠ করে অস্ত্রপাতি নিয়ে যায়— তবুও পাক বাহিনী আমার চেষ্টার ফলে হিজলা থানাতে গিয়ে জনগণকে কোনরূপ অত্যাচার, অবিচার বা অপারেশন করতে পারেনি। লুটপাটতো দূরের কথা নিজের অতি কষ্টার্জিত সঞ্চয় থেকে আটকে পড়া মুক্তিযোদ্ধা ও বিপদগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য করেছি। এই ভাবে সুকৌশলে পিস কমিটির মধ্যে থেকে আমি জনগণের উপকার করেছি। যা পিস কমিটির বাহিরে থেকে করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু আফসোসের বিষয় যে সব নেতা ও উপনেতা মুক্তিযুদ্ধ না করেও কলিকাতা শহরে ভারতীয় সরকারের খরচে ও আরাম-আয়াসে আফসে থেকেছেন তারাও আমাদের যারা স্বদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করিনি বরং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশে জনগণের মধ্যে থেকে জনগণের জন্য কাজ করেছি তাদেরও পাকিস্তানী দালাল, বা কোলাবোরেটর কোন মুখে বলতে পারেন তা পাঠকদের বিচারের উপরই ছেড়ে দিলাম। তবে আমি আমার নিজের কথা বলে যাচ্ছি যে, পিসকমিটিতে থেকে আমি যদি জনগণের অহিতকর কোন কাজ করে থাকি বা অসদোপায়ে ধনসম্পদ অর্জন করে থাকি তা হলে যেন বর্তমান সরকার বা ভবিষ্যতের সরকার তার বিচার করেন আমি এই অনুরোধ করে গেলাম।

আগেই বলেছি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে এই পিস কমিটি সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি এমন কি জেল-ফাঁসির সম্ভাবনা আছে জেনেও আমি জনগণের মঙ্গলের জন্য পিস কমিটিতে যোগ দিয়েছিলাম। তাই স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই সংসার চালাবার ব্যবস্থা হিসেবে আমার ছেলেরা তিনজন নাবালক থাকাতে আমার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে কিছু দিন চালাবার মতো ব্যাংক চেক কেটে তার হাতে দিলাম যাতে পারিবারিক কাজ কর্ম ও সংসার চালাতে তার কোন আপাতত কষ্ট না হয়। আমার স্ত্রীকে তার শত অনুরোধ সত্ত্বেও এই নির্দেশ ও চেক লেখার কারণ এবং আমার জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা জানতে দেইনি। আমি সম্পূর্ণপ্রস্তুত হয়ে জেলে যাওয়ার জন্য স্বগৃহে অপেক্ষা করছিলাম।

উৎস মেজর (অবঃ) মোহম্মদ আফসারউদ্দিন, *আমার দেখা বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৯।

পরিশিষ্ট. ১৩
[মিছির উল্লাহ্‌র বক্তব্য]

উপসংহারে বইখানা লিখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যে জাতি তাহার নিজের পূর্ব পুরুষের ইতিহাস জানে না সে জাতি বেশী দিন স্বকীয়তা নিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে আমাদের জাতীয় নেতারা কিংবা রাষ্ট্র নায়করা আমাদের রাজনৈতিক কি সামাজিক ইতিহাসের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই যদ্দরুণ অমাদের ইতিহাসে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার ফলশ্রুতিতে বিদেশী এবং বিধর্মী সংস্কৃতির প্রভাবে গোটা বাঙ্গালী মুসলমান জাতি হাবুডুবু খাইতেছে।

আমাদের ভবিষ্যত বংশধর আমাদের জাতির ইতিহাস সাহিত্য, সংস্কৃতির দিকে নজর না দিয়া বিকৃত ইতিহাস, ভ্রান্তদর্শন অপসংস্কৃতি এবং অপকীর্তি নিয়া মাতাল হইয়া আছে। যদি তাহারা আমাদের অমূল্য রত্নভাণ্ডারের দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করিত তবে আমার বিশ্বাস তাহারা কখনও এই ভ্রান্তপথে ধাবিত হইত না। আজ চীন এবং রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হাস্যের উদ্রেক হয়।

উভয় দেশ অর্ধ শতাব্দির উর্দ্ধকাল যাবৎ তাহাদের সামাজিক নীতি স্বদর্পে পৃথিবী ব্যাপিয়া বিস্তার করিয়া এখন নিজের ঘর সামলাইতে না পারিয়া দৃঢ়হস্তে সংস্কারের দিকে মনযোগ দিয়াছে। তাহারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের রাষ্ট্রীয়নীতি এক ক্রুটিপূর্ণ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা মানব মনের এবং সমাজের চাহিদা মিটাইতে একেবারে ব্যর্থ। মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং ক্রুটীপূর্ণ ইহা নিয়া মানুষ যাহা সৃষ্টি করে তাহা ক্রুটীপূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন জ্ঞানদ্বারা মানব জাতিকে সময় সময় যে বিধান দিয়াছেন তাহা চিরন্তন এবং সর্বকালের উপযোগী ও মঙ্গলজনক।

মুসলমানদের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি আরবী ফার্সী এবং উর্দুতে লিখিত হওয়ায় তাহা কেবলমাত্র আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণ মুসলমান সমাজে ইহার কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারায় আমাদের বংশধরগণ বিভিন্ন মতবাদের পুস্তকাদি পাঠ করায় তাহাদের মন ও মগজ অন্যভাবে গঠিত হইয়াছে।

আমাদের উচ্চ শিক্ষিত ভবিষ্যত সমাজের ধারক এবং বাহকদিগকে আমাদের বাল্যকালের সামাজিক অবস্থা ও ইতিহাসের কথা শুনাইলে তাহারা যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অত্যন্ত উৎসুকের সহিত আমাদের কথা শ্রবণ করে। বর্তমানের ন্যায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ রাজনীতির দিকে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া আরবী ফার্সী ও উর্দুভাষায় লিখিত ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বাংলাতে তর্জমা করিয়া আমাদের যুব সমাজের মনের খোরাক যোগাইতেন তবে আমরা কখনও এ অবস্থার সম্মুখীন হইতাম না।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের সম্মুখে কোন দর্শন নাই। একেক দল একেক দর্শন নিয়া মাঠে বিচরণ করিতেছে কিন্তু কোন দলই দেশকে সঠিক পথে চালাইবার সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন দর্শন জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ফলে দেশে অশান্তি এবং নৈরাজ্য বিরাজমান।

জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া চুরমার, বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া একটি জাতি উন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে না। অন্যদিকে বৃহৎ প্রতিবেশী তাহার আগ্রাসনী এবং আধিপত্যবাদের জাল বিস্তার করিয়া নাকানী চুবানি খাওয়াইতেছে। এমতাবস্থায় আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে যদি সঠিক পথে পরিচালিত না করেন তবে আমাদের অবস্থা যথা পূর্বং ততা পরং-ই হওয়ার আশঙ্কা।

উৎস মোঃ মিছির উল্লাহ, স্মৃতির প্রেক্ষাপট, মৌলভীবাজার, ১৯৮৭।

পরিশিষ্ট : ১৪

মানবাধিকারের প্রবক্তা সেজেছে মৌলভীবাজারের মিছির উল্লাহ

একাত্তরের এক কুখ্যাত রাজাকার এখন মানবাধিকারের প্রবক্তা সেজেছে। বর্তমানে মানবাধিকার বাস্তবায়ন কমিটি মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতির পদটি তার দখলে। জেলায় তাকে সবাই চেনে মিছির উল্লাহ মোক্তার নামে। আগে আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বেশ কিছুকাল যাবত চলছে তার অবসরজীবন। তবে প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শহরের সৈয়দ সিকান্দর আলী রোডস্থ তার বাসভবনে মৌলবাদীদের 'মজমা' বসে। তা ছাড়া সমাজে

নিজের পরিচয় লুকিয়ে 'ভাল মানুষ' প্রমাণের জন্য 'প্রবীণ হিতৈষী সংঘ' এবং 'জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান' নামের দু'টি সংগঠন খুলে বসেছে সে। তার পরও স্থানীয় মানুষের কাছে মিছির উল্লাহ মোক্তার তার রাজাকারী মুখোশ ঢাকতে পারেনি। মুখে ধর্মের কথা বললেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি নেই তার কোন শ্রদ্ধা। মৌলভীবাজার শহরে অবস্থিত হযরত সৈয়দ শাহ জালাল (রঃ)-এর মাজার বন্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে তার প্ররোচনায় কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়। যাকে মৌলভীবাজারবাসী মামলাবাজ হিসাবেও চেনে। মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্য অজুহাতে নানাভাবে হয়রানি করে। বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মহসিন আলী মৌলভীবাজারের পৌর চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় তার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিরুদ্ধে সে বেশ কয়েকটি মামলাও করে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৌলভীবাজার আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও প্রবীণ লেখক, এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে '৭১-এর বিভিন্ন ঘটনার কথা বলে এই সমস্ত লিখে জনগণকে পুরনো কথা মনে করিয়ে না দিলে কি আপনার মনে শান্তি হয় না। সেই ঘৃণ্য রাজাকরকে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে কমিটিতে না রাখায় বিভিন্ন অজুহাতে পূর্তি অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। '৭১-এর সেই ঘাতকের এতই প্রভাব যে তার এই সব কুকীর্তির প্রতিবাদ করার সাহস কেউ রাখেনি। যদি কেউ তার প্রতিবাদ করে সে সাথে সাথে বিভিন্ন লোকজন দিয়ে তার বিরুদ্ধে নামে-বেনামে মামলা ঠুকে দিয়ে অনর্থক হয়রানি করে। মৌলভীবাজার শহরে বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক মিছির উল্লাহ আজও অভিন্ন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে। এই মিছির উল্লাহ গং নিরীহ দু'জন লোককে ধরে এনে মনু নদীর ব্রিজের ওপর হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ১২ মে সকাল বেলা শহরতলির হিলালপুর গ্রামে মিছির উল্লাহ গংয়ের নির্দেশে পুরো হিলালপুর গ্রাম ঘিরে ফেলে। পাক সেনারা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় মোঃ উস্তার, সিরাজুল ইসলাম ও তার বৃদ্ধ পিতা আব্দুল মন্নানকে। মোঃ উস্তার মোস্তাফাপুর ইউপি কমিটির একজন বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম ছিলেন পুলিশ বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা। তাঁর পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। এই তিন জনকে মৌলভীবাজার শহরে ধরে এনে দিনভর নির্যাতন করা হয়। রাতের বেলা তাঁদের জেলহাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই তিন জনকে ধরে নেয়ার পর এলাকার শান্তি কমিটির লোকজন তাঁদের বাড়িঘর লুটপাট করে। তাঁরা পাক বাহিনীর পক্ষ থেকে এঁদের বাঁচিয়ে দেয়ার জন্য এক লাখ টাকা দাবি করে। কিন্তু দেশে যুদ্ধ থাকায় এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদের পরিবার এক লাখ টাকা যোগাড় করতে পারেননি। ফলে মিছির উল্লাহ গং ১৩ মে ভোর

বেলা তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মৌলভীবাজার থানার তৎকালীন ওসি তজমুলকে দিয়ে পুলিশের জীপে মাইক বেঁধে সকাল থেকে সারা শহর মাইকিং করা হয়। মাইকিংয়ের ভাষা ছিল– মৌলভীবাজার শহরের জনগণ পার্শ্ববর্তী মনু ব্রিজের ওপর যেন হাজির হয়। পাশাপাশি সারা শহরের দোকানপাট, অফিস-আদালত বন্ধ করে লোকজনকে পাক সেনারা মনু নদীর ব্রিজের ওপর যেতে বাধ্য করে। মনু নদীর ব্রিজের দুই পাশে শত শত লোকসমাগম ঘটলে মাইকযোগে ঘোষণা করা হয়, হিলালপুর গ্রাম থেকে তিন দুষ্কৃতকারীকে আটক করা হয়েছে। এরা পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের বিচার করা হয়। বিচারের রায়ে ঘোষণা করা হয়, দু'জন রাষ্ট্রদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। বাকি একজনের বয়স বেশি থাকায় তাকে মুক্তি দেয়া হবে। এই ঘোষণার পর পরই পাকি বাহিনীর জীপের ওপর থেকে মোঃ উস্তার ও সিরাজুল ইসলামকে মনু ব্রিজের রেলিংয়ের পাশে দাঁড় করানো হয়। প্রথমে মোঃ সিরাজুল ইসলামকে লক্ষ্য করে পাকি ক্যাপ্টেন ইউসুফের নির্দেশে মনু ব্রিজের দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত জনতার সামনে দুই রাউন্ড গুলি ছোড়া হলো। তারপর মোঃ উস্তারের ওপর তিন রাউন্ড গুলি ছোড়া হলো। সাথে সাথে দু'জনই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর অবসস্থায় মনু নদীর ব্রিজের ওপর ঢলে পড়েন। খুনীরা এঁদের লাশ মনু নদীতে ফেলে দেয়। মনু নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যায় মোঃ উস্তার ও সিরাজুল ইসলামের লাশ। এঁদের রক্তে লাল হয়ে যায় মনু নদীর পানি। নদীর দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত মানুষ অসহায় অবস্থায় নীরবে অশ্রু ফেলে। মোঃ উস্তারের পিতা মন্নানকে নিষ্কৃতি দেবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাকি ঘাতক এবং রাজাকাররা কথা রাখেনি। তারা শহরের পার্শ্ববর্তী বড় বাড়ি পাহাড়ে নিয়ে বৃদ্ধ মন্নানকেও গুলিতে হত্যা করে। রাজাকার মিছির উল্লাহ মোক্তার সম্প্রতি বিদেশে গেছে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে, এখনও ফিরে আসেনি।

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০.১.২০০১